সাহিত্য সংস্কৃতি সমাজ জিজ্ঞাসার মুখপত্র

চতুষ্কোণ

পঞ্চদশ বর্ষ
২য়-৩য় সংখ্যা

॥ রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্র ॥
॥ শিল্প ও সৌন্দর্য ॥
॥ অশান্ত পাঞ্জাব ॥
॥ পঞ্চভূতের আসর ॥
॥ শরৎ প্রদক্ষিণ ॥
॥ বাঙ্গালীর শেক্‌স্‌পীয়র চর্চা ॥
॥ বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব ॥
॥ সমাজচিন্তা ॥
॥ এ ছাড়া গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা ইত্যাদি ॥

সম্পাদক : কিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল

JADAVPUR UNIVERSITY

List of Pnblications

SANSKRIT

1. ANVIKSA : Vol. I. Part I, Vol. II. Part I, Vol. II. Part 11, Vol. III. Part. I, Vol. III. Part II & Vol. IV. Part I, Vol. IV. Part II & Vol. V. Part I, Vol. *V. Part II, Vol. VI., *Vol. VII, Edited by Dr. Ramaranjan Mukherjee, *Dr. S. Goswami— each copy Rs. 5·00
2. Tattvasandarbha by Srijiva Gosvamin Edited by Dr. Sitanath Goswami Rs. 6·00
3. Bhagavatsandarbha by Srijiva Gosvamin Edited by : Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 10·00
4. Paramatmasandarbha by Srijiva Gosvamin Edited by : Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 8·00
5. Studies in the Evolution of Bhakti Cult. (Part I) by Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 15·00
6. Studies in the Evolution of Bhakti Cult. (Part II) by Dr. Chinmayi Chatteriee Rs. 80·00
7. Amalananda by Himangshu Narayan Chakraborty Rs. 15·00
8. Sri Bhakti Sandarbha by Srijiva Gosvamin, Edited by Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 60·00
9. Paninidarsanam Edited by Dr. Chinmayi Chatterjee Rs. 50·00

HISTORY

1. Journal of History Vol. II : Edited by Dr. S. K. Maity Rs. 20·00
2. Journal of History Vol. III : Edited by Dr. S. K. Maity Rs. 20·00

ECONOMICS

I. Economic Theory, Policy and Estimation —by Department of Economics Rs. 15·00

2. Land Reform in Eastern India —Edited by Dr. Manjula Bose Rs. 50·00

*Books are available at the Jadavpur University Press and Granthalok, National Council of Education, Calcutta-700032

Printers at Your Beck and Call

THE SPECTRUM

2A, Shivagopal Banerjee Lane

Salkia, Howrah-711106

Phone : 66-3928

Space donated by :

A WELL WISHER

From LAKSHMI NARAYAN ROAD,
CALCUTTA-700 065

With Best Compliments from :

D. B. Enterprise

32/10, Gariahat Road (South)

CALCUTTA-31

With Best Compliments from :

M/s. Industrial Steels Corpn.

Room No. 15/31

40, STRAND ROAD,

(Ground Floor)

CALCUTTA-700 001

॥ সি. এম. ডি. এ. কি কি করে ॥

মহানগরীর ৫৪০ বর্গমাইল এলাকায় ১ কোটি ৩ লক্ষ লোকের জন্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

চলাচলের সুবিধার জন্য রাস্তা চওড়া হচ্ছে, ব্রীজ, ফ্লাইওভার, সাবওয়ে, বড় রাস্তা ইত্যাদি বানানো হয়েছে। বৃহত্তর কলকাতার এক বিরাট এলাকায় নতুন নালা নর্দ্দমা খুঁড়ে জল-মগ্নতার প্রকোপ কমাবার চেষ্টা হচ্ছে।

মহানগরীর সমস্ত বস্তীতেই পানীয় জল, পাকা রাস্তা, পাকা পায়খানা এবং বিজলীর ব্যবস্থা হচ্ছে।

তিনটি জায়গায় নতুন উপনগরী স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

এছাড়া সি. এম. ডি. এ. নতুন প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, বর্ত্তমান স্কুলগুলির সংস্কার, স্বাস্থ্য প্রকল্প, উদ্যান এবং কলকাতা থেকে খাটাল সরিয়ে নতুন দুগ্ধ উপনগরীতে পুনর্বাসনের কাজ কিছু কিছু করে থাকেন।

গত দশ বছরে যে কাজ হচ্ছে তার পরিচয় অনেকেই পেয়েছেন। অনেক কাজ এখনও বাকী। সব কিছু জানতে হলে অথবা সমালোচনা করতে হলে সরাসরি লিখুন : জন সংযোগ বিভাগ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি. এম. ডি. এ.), ৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-১৭।

— • • —

With Best Compliments of :

TRACTORS INDIA LIMITED

1, Taratolla Road,
Calcutta-700 024

With the best complimenth of :

G. S. ENTERPRISES

10, CLIVE ROW,
CALCUTTA-700001

Dealers in :
Aluminium Section, Ingot, Scraps
Rods, Sheets etc.

সম্প্রতি প্রকাশিত / পুনর্মুদ্রিত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খাপছাড়া

'সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।' —প্রবেশক, খাপছাড়া

ছড়া-জাতীয় নানা ছন্দে রচিত সরস কবিতাগুলি সব বয়সের মানুষেরই উপভোগ্য—কতকগুলি কবিতার রস ছোটো ছেলেমেয়েরা পুরোপুরি সম্ভোগ করতে না পারলেও সেগুলিরও ধ্বনি তাদের আনন্দ দেবে।

প্রতিটি কবিতার সঙ্গে, কবি-অঙ্কিত শতাধিক স্কেচ এবং রঙিন চিত্রের রস সকলেই উপভোগ করতে পারবেন। মূল্য ৫·০০ টাকা।

প্রহাসিনী

জীবনটা যখন (১৩৪৫) কখনো গভীর অধ্যাত্ম ভাবে সমাহিত কিম্বা বিদায়ের করুণ রসে সিক্ত তখনই "মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু।" তারপর "ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা করি নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুঁটি।"

প্রহাসিনীর কবিতাগুলি সেই নির্মল কৌতুকের বিদ্যুচ্ছটায় উদ্ভাসিত। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের, ভিন্ন রসের কবিতা সংকলন। মূল্য ১৬·০০ টাকা।

ভগ্নহৃদয়

ভারতী পত্রিকায় আংশিক প্রকাশিত ভগ্নহৃদয় গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত শতবর্ষ পূর্বে ১২৮৮ বঙ্গাব্দে, অতঃপর রবীন্দ্র রচনাবলী 'অচলিত' প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থ শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র-ভবনে সংরক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। পাণ্ডুলিপি-চিত্র-সম্বলিত। মূল্য ২৫·০০ টাকা।

সংগীতচিন্তা

পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ

সংগীতবিষয়ক রবীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য সমস্ত রচনার সংকলন। গ্রন্থটির বিভিন্ন অধ্যায়ের বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা পত্রালোচনা গ্রন্থসমালোচনা এবং কোনো কোনো প্রবন্ধের অংশবিশেষ ও একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ নতুন সংযোজিত। পাণ্ডুলিপি এবং আলোকচিত্র শোভিত। মূল্য—২৫·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা-১৭
বিক্রয় কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার / ২১০ বিধান সরণী

With Best Compliments of :

JAI GLASS AND CHEMICALS
(PVT) LIMITED

KESORAM INDUSTRIES &
COTTON MILLS LTD.
9/1, R. N. Mukherjee Road,
Calcutta-700 001

Manufacturers of :

Cotton Textiles & Piece Goods, Rayon Yarn, Transparent Cellulose Film, Sulphuric Aeid, Carbon-di-Sulphide, Cast Iron, Spun pipes, Cement & Refractories etc etc

Sections—	Mills—
Textile Section	42, Garden Reach Rd. Calcutta
Rayon & T.P. Seetion	Tribeni, Hooghly
Spun Pipe Section	Bansberia, Hooghly
Cement Section	Basantnagar
Refractory Section	Dt. Karimnagar (A.P.)
	Kulti, Dt. Burdwan

Calcutta University Publications

1. Padamrita Samudra (In Bengali)
—Dr. (Mrs) Uma Roy .... Rs. 160-00
2. Acharya-Vandana
Dr. Bhandarkar Cent. Volume Rs. 145-00
3. Romance of Indian Journalism
—Jitendra Nath Basu .... Rs. 75-00
4. Anand Coomarswamy—K. K. Dasgupta Rs. 60-00
5. A Linguisitc Study of Personal Names aud Surnames in Bengali—Dr. Bhabataran Dutta Rs. 80-00
6. Liberty, Equality, Property and the Constitution
—P. J. Reddy Rs. 90-00
7. The Human Journey—Edwin A. Burtt Rs. 30-00
8. Catalogue of Paintings of the Asutosh Museum
—Niranjan Goswamy Rs. 250-00
9. Logical and Ethical Issues of Religious Belief
—A. K. Motilal Rs 75-00
10. Banglar Vaisnab Bhabapanna Musalman Kabir Padamanjusa (In Bengali)
—Dr. Jatindra Mohan Battacharyya Rs. 50-00

Please Enquire at :

Publication and Book-Depot,
48, Hazra Road, Catcutta-19

With Best Compliments of :

Sri P. Mohan

ELMECH ENGINEERS
4, TARPAN GHAT STREET,
CALCUTTA-700 053

১৫শ বর্ষ
২য়-৩য় সংখ্যা

আলেখ্য

কার্তিক-চৈত্র
১৩৯১

॥ সূচীপত্র ॥

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্র ॥ পৃঃ ১২৩
শিল্প ও সৌন্দর্য ॥ পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য ॥ ১২৬
অশান্ত পাণ্ডাব ॥ অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ ১৩৩
পঞ্চভূতের আসর ॥ ১৪৭
কবিতা
স্বত্ত্যহীন ॥ রেণুকণা পাকড়াশী ॥ ১৫৫
স্থানাভাব ॥ কল্যাণ সেনগুপ্ত ॥ ১৫৬
বাঁচার কবিতা ॥ তরুণ মুখোপাধ্যায় ॥ ১৫৭
শরৎ প্রদক্ষিণ ॥ দ্বিষাম্পতি চৌধুরী ॥ ১৫৮
বাঙ্গালীর শেক্‌স্‌পীয়র চর্চা ॥ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ ১৭১
দ্বৈরথ ॥ গল্প ॥ জয়কৃষ্ণ কয়াল ॥ ১৮০
এপিঠ ওপিঠ ॥ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত ॥ ১৯২
বৈষ্ণবধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব ॥ দিলীপকুমার দত্ত ॥ ২০১
ফেলে আসা দিনগুলি ॥ জগদীশনারায়ণ সরকার ॥ ২১১
সমাজচিন্তা ॥ ২২৬

সম্পাদক : ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল
দপ্তর : ৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ
কলিকাতা-৭৫
ফোন : ৭২-১৫৬২

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ১০·০০ টাকা
আজীবন গ্রাহক চাঁদা : ১০০·০০ টাকা
বিদেশে বার্ষিক চাঁদা : ৫ ডলার
আজীবন গ্রাহক চাঁদা : ৫০ ডলার

ঘোষণা

পত্রিকার নাম ॥ আলেখ্য ॥ ভাষা : বাংলা
প্রকাশনার কাল—ত্রৈমাসিক
প্রকাশনার স্থান—৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা-৭৫
পত্রিকার মালিক, প্রকাশক, সম্পাদক ও মুদ্রক : শ্রীক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল
নাগরিকত্ব—ভারতীয় নাগরিক
ঐ ঠিকানা : ৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা-৭৫

উপর্যুক্ত ঘোষণা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সত্য।

স্বাক্ষর : ক্ষিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল
প্রকাশক : আলেখ্য

রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত পত্র

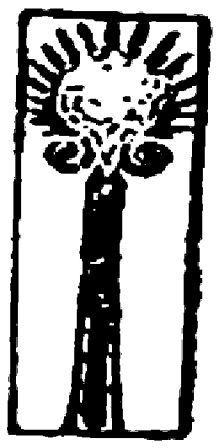

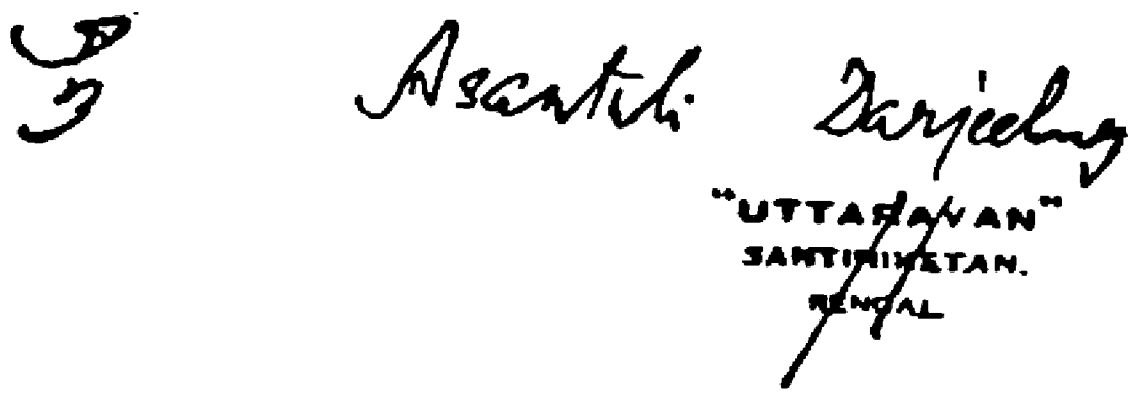

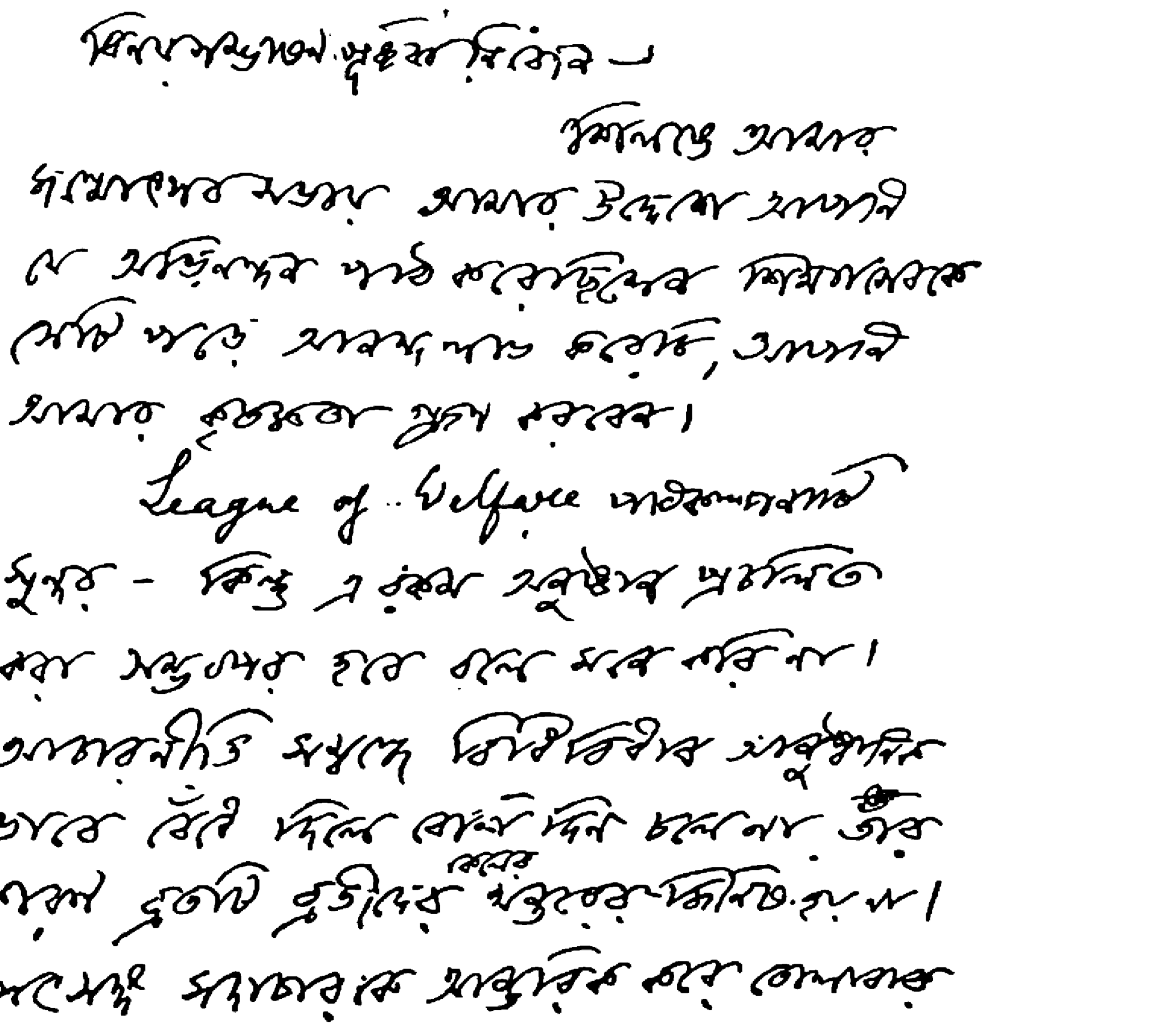

ওঁ Asantuli Darjeeling

বিনয় সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

শিলঙে আমার জন্মোৎসব সভায় আমার উদ্দেশে আপনি যে অভিনন্দন পাঠ করেছিলেন শিক্ষাসেবকে[১] সেটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি, আপনি আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করবেন।

League of Welfare[২] পরিকল্পনাটি সুন্দর—কিন্তু এ রকম অনুষ্ঠান প্রচলিত করা সম্ভবপর হবে বলে মনে করি না। আচারনীতি সম্বন্ধে বিধি-বিধান আনুষ্ঠানিক ভাবে বেঁধে দিলে বেশি দিন চলে না, তার কারণ ব্রতটি ব্রতীদের সকলের অন্তরের জিনিষ হয় না। সৎসঙ্গ সদাচারকে আন্তরিক করে তোলাবার একমাত্র পন্থা ব্যক্তিগত প্রভাব। সে প্রভাব সর্বত্র সুলভ নয়।

পরলোকগত রমাকান্ত রায়কে[৩] আমি উৎসাহ ও আনুকূল্য দান করেছিলাম কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমার স্মৃতি আজ নিতান্তই অস্পষ্ট।

মণিপুর থেকে দুজন নৃত্যশিক্ষক কিছুকাল শান্তিনিকেতনে রেখেছিলাম, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁদের বিদায় দিতে হয়েছে। মেয়েরা অনেকেই শিক্ষা করতে পেরেছে। ইতি—১৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পত্রপ্রাপক পরিচিতি—

রবীন্দ্রনাথের অমুদ্রিতপূর্ব এই পত্রখানির প্রাপক আসামের তদানীন্তন ডি. পি. আই. বা শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা, সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়। সতীশচন্দ্র শ্রীহট্টবাসী: শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত জলসুকা গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক নিবাস ছিল। জলসুকা গ্রাম নিতান্ত অখ্যাত নয়: ঐ গ্রামেই ১৯০৫ সালে সুরমা উপত্যকার প্রথম জাতীয় সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং সেই সভায় স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র তরুণ বয়সেই ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নানা সমাজ-উন্নয়নমূলক কর্মধারা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের সহিত যুক্ত হন। তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সসম্মানে এম. এ. পাশ করিয়া বিলাত হইতেই I. E. S. হইয়া আসামের শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে যোগদান করেন। তিনি বহুদিন আসামের বিদ্যালয়সমূহের মুখ্য পরিদর্শক ছিলেন এবং পরে শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা হন। এই পত্রপ্রাপ্তির কালে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত রায়, কেবল শিক্ষাবিষয়েই নয়, নানা বিষয়েই বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর বাংলা, ইংরাজী এবং অসমীয়া ভাষায় রচিত পুস্তকের সংখ্যা

অন্যূন পঁচিশ খানি। এ ছাড়া নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁহার অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ছড়াইয়া আছে।

সতীশচন্দ্র যে কখন কোন্ সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন তাহা সঠিক বলা কঠিন, তবে কবির প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তাঁহার নানা লেখার মধ্যেই সূচিত। রবীন্দ্রনাথও এই মনস্বী শিক্ষাব্রতীর প্রতি যে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাহা এই আলোচ্য পত্র হইতেও প্রতীয়মান হইবে।

তরুণ বয়সের ব্রাহ্ম সতীশ রায় মহাশয় শেষ বয়সে গোঁড়া বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হন এবং 'হরিদাস রামানন্দ' নাম গ্রহণ করেন। এক সময়ে তিনি বৃন্দাবনের বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয়েরও উপাচার্য হইয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সতীশচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত নিরহঙ্কার ও অমায়িক এবং অপরের গুণের সমাদরে সদাসমুৎসুক। তিনি অত্যন্ত পরহিতব্রতী এবং দানশীলও ছিলেন। বহু ছাত্রকে, বাঙালী-অসমীয়া-হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে, তিনি প্রভূত অর্থানুকূল্য করিতেন। বহু দুস্থ দুর্গত ব্যক্তিও নিয়মিত তাঁহার অর্থ সাহায্য পাইত।

নির্দেশিকা—

১। শিক্ষাসেবক— শিলচর নর্ম্যাল স্কুলের মুখপত্র। ইহা প্রধানতঃ সতীশ রায় মহাশয়ের আগ্রহে ও অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হইত।

২। League of Welfare— সমাজকল্যাণমূলক তাঁহার এ-পরিকল্পনাটির রূপরেখা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার আদর্শবাদী চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। রমাকান্ত রায়— ইনি সতীশ রায় মহাশয়ের স্বগ্রামবাসী ও আত্মীয় ছিলেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হইয়া কারিগরীবিদ্যা লাভের জন্য তিনি জাপানে যান। সম্ভবতঃ তিনিই জাপানে প্রথম ভারতীয় শিক্ষার্থী। তাঁহার একটি জীবনী কলিকাতার 'চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং' প্রকাশনী হইতে ইং ১৯৫০ সালে (বাং ১৩৫৭) প্রকাশিত হয়। সতীশচন্দ্র রায় এবং এই পরিচিতি-লেখক যুগ্মভাবে উহার সম্পাদনা করেন। উহার ভূমিকা লেখেন ডঃ শ্যামা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীষতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

শিল্প ও সৌন্দর্য

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

॥ ২ ॥

আমাদের আধুনিক শিক্ষা ও সভ্যতার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে তৌলন-পন্থায় সব কিছু বুঝে নেওয়া। তাতে বস্তুর মূল্যমান ঠিক ভাবে স্থিরীকৃত হয়। তুলনায় জগতে প্রবেশ কালে কৌতূহল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের পরিধিও বেড়ে যায় এবং আমরা সাম্য-বৈষম্যের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে পরিশেষে ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করে আনন্দ লাভ করি। তৌলন পন্থায় ধর্ম, আচার-আচরণ আলোচনা, তৌলন পন্থায় দেবলোক দর্শন, তৌলন পন্থায়—মানুষের ভাবনা ও চিন্তা রাজ্যের সন্ধান, ঐ পন্থায় ভাষা ও ভাষাতত্ত্ব বিশ্লেষণ : আমাদের বিংশ শতাব্দীর এক অভিনব অনুশীলন। আমরা জানতে পেরেছি, শাখায় শাখায় বিভক্ত প্রাচীন আর্য জাতিরা এক ভাবের ভুবনে ভ্রমণ করতেন। তাঁরা দেশে দেশে ছড়িয়ে গেলেও তাঁদের চিন্তারাজ্যে ঐক্য ছিল। সেই ঐক্য আবিষ্কার আমাদের নানাদিকে উৎসাহিত করে। আর্যজাতির তিনটি প্রধান শাখা গ্রীক, ইরাণী এবং ভারতী। তাঁদের শিল্প সৌন্দর্য চিন্তায় তাঁদের মৌলিকতার স্বাক্ষর তাঁরা রেখে গিয়েছেন। যদিও তাতে তাঁদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়ে ওয়ে ওঠে, তথাপি তাঁদের সাহিত্য মীমাংসায় এবং সৌন্দর্য-চিন্তায় তাঁদের ভাবের ঐক্যই বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। এই আলোচনায় স্থির বিন্দু হবে এইটি।

শিল্প-সৌন্দর্য বুঝবার জন্য এবং বোঝাবার জন্য গ্রীস এবং ভারতে শাস্ত্র তৈরী হয়েছে। সেই সব মীমাংসক পণ্ডিতের নানা পথে চক্রাকারে পরিভ্রমণ আমাদের নানা প্রকার তর্কস্বরণির দেয়। কিন্তু শেষ সিদ্ধান্তে তাঁরা অর্থনির্বাক। তাঁদের তর্জনী সঙ্কেত অনির্বচনীয়তার দিকে। এই সৌন্দর্যবোধ যে একপ্রকার অনুভূতি তা কেউ অস্বীকার করেন না, করতে পারেন না। এই উপলব্ধি বা Perception-কে আকারে প্রকারে সাধারণ ধর্ম দিয়ে Concept আকারে তাঁরা ঠিক গড়ে দিতে পারেন না।

গ্রীসে এই জন্য শাস্ত্র গড়ে উঠেছিল। এই শাস্ত্রকে বলা হয় Aesthetics—যার অর্থ হচ্ছে বোধের আকারে সৌন্দর্য, রুচি ও শিল্প—A feeting of beauty in objects, the principle of taste and art. এই

আয়েস্থেটিকস্-এর মূলে আছে ক্রিয়া Aisthetikos—যার অর্থ হলো অনুভব করা, ইন্দ্রিয় গোচর করা এবং যার পরিণামে আসে আনন্দ।

গ্রীক জাতি Tragedy, Comedy, Epic এবং Poetry নিয়ে যতই বিশ্লেষণ করুন, তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন আনন্দবাদকে—এইজন্য এই তত্ত্ব সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব। এমন যে সাহিত্য-শত্রু Plato তিনিও সকল প্রকার কাব্যকে ধূলিসাৎ করতে চান নি। T.S. Dorsch তাঁর Classical Literary Criticism পুস্তকের ভূমিকায় বলেছেন—'Even in the Republic he is ready to give a favourable hearing to those who wish to defend poetry, as we shall gain much if we find her a source of profit as well as pleasure.' এই অর্জন এবং আনন্দ দীর্ঘ দীর্ঘ শতাব্দী ধ'রে গ্রীকোরোমান জগৎকে সাহিত্যমুখী ক'রে রেখেছিল। Plato-Aristotle-এর সুদীর্ঘ তিন শতাব্দীরও বেশি পরে ইটালীর Horace তাঁর 'Ars Poetica' গ্রন্থে সেই অর্জন ও আনন্দের কথা তুলেছেন।—

"Poets aim at giving either profit or delight or at combining the giving of pleasure with some useful precepts of life." আবার একটু পরেই তিনি বলেছেন, 'the man who has managed to blend profit with delight wins every one's approbation, for he gives his reader pleasure, at the sametime instructs him [Ars Poetica, 333-34, 343-44]. Horace তাঁর গ্রন্থে বার বার 'Dulce et Utile'—sweet and useful বলে' তারস্বরে ঘোষণা করেছেন। এটাই কোন কোন শাখার সাহিত্য মীমাংসায় বহু নিন্দিত সুনীতি ও শুভবাদ। Aristotle সম্বন্ধে অন্য প্রসঙ্গ আসবে বলেই তাঁকে বাদ দিয়ে বলছি, এই যে Republic থেকে Ars Poetica-র দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী—এর মধ্যে সাহিত্য তত্ত্ব যে 'অর্জন ও আনন্দ' বিস্মৃত হতে পারল না, তার তরঙ্গ আরও প্রায় সহস্র বৎসর অপর এক আর্যশাখায় প্রবাহিত হলো। যে মম্মটভট্ট কবির পক্ষ নিয়ে প্রাজাপত্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে' কাব্য বাণীকে 'নিয়তিকৃত নিয়ম-রহিতা' বলেছিলেন—যাঁর মতে কাব্যবাণীর শেষ পরিণাম আনন্দে, সেই তিনি গ্রীকো-রোমান শাখার ক্ষুণ্ণ পন্থায় ঘোষণা করলেন—কাব্য থেকে কবি ও পাঠকের অর্জনও কম নয়।—

"কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর ক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে, কান্তাসম্মিতয়োপদেশ যুজে।"

কাব্য কি না দেয়? কালিদাসাদীনামিব যশঃ। শ্রীহর্ষাদের্ধাবকাদীনামিব ধনম্। রাজাদিগতোচিত-আচার পরিজ্ঞানম্। আদিত্যাদের্ময়ূরাদীনামিব অনর্থ নিবারণম্।—তারপর প্রিয়তমার মত উপদেশবর্ষণম্ এবং সর্বশেষ সর্বসার-ভূত বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য পরনির্বৃতি বা আনন্দযোগ। বৃত্তির ভাষায়—"সকল প্রয়োজন মৌলী-ভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদন-সমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরম্ আনন্দম্"।

গ্রীকোভারতের চিন্তারাজ্যের মিলনস্থলের কথা আরও একটু বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়। আচার্য সুরেন্দ্রনাথ Aesthetics-এর নাম দিয়েছেন—বীক্ষা শাস্ত্র। আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি শিক্ ধাতুর সাম্রাজ্য চাক্ষুষ, প্রত্যক্ষ থেকে মানসিক অনুভূতি পর্যন্ত দূরবিস্তৃত। আর গ্রীকভাষার মৌল ধাতুটির অর্থ অনুভূতি (Perception)। এ বিষয়ে ভারতীয় এবং গ্রীসীয় দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু একই। সেই জন্য কাব্য-সৌন্দর্যানুভূতিতেও তাঁরা একই পথের পথিক। সে রহস্য আমরা ভারতীয় রসশাস্ত্রের সত্ত্বোদ্রেক এবং আরিস্তোতল্ নির্দিষ্ট Katharsis-এর বিশ্লেষণে দেখাতে চেষ্টা করব। সৌন্দর্য—তা যে কোন প্রকার শিল্পসৌন্দর্য হোক—সেটি অনুভবগম্য। ঠিক ঠিক আকারে প্রকারে, বচনে নির্বচনে, সংজ্ঞায় দৃষ্টান্তে—এক কথায় যথাযথ স্বরূপ বিশ্লেষণের আয়ত্ত নয়। তাকে অনুভব কর। কাব্যের যিনি উদ্গাতা শিল্পের যিনি স্রষ্টা, তিনিও তো তাকে ধ্যানে দেখেছিলেন, কথা বলেন নি। তিনি ধ্যানে দেখে তাকে রূপে স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি চিন্ময় হ'য়ে চিত্রময় হয়েছেন বা বাঙ্ময় হয়েছেন। মনোময়কে আপন অনুভূতিরই ভাষায় অনুবাদ করে দিয়েছেন। সে অনন্তপরতন্ত্র, Unique, তুমিও সেই ভাবলোক থেকে দেখ। কথা বলতে যেও না, নেশা তরল হয়ে যাবে। বিচার করলে দেখতে পাবে "বিভাবাদ্যেন চিত্তবৃত্তি বিশেষ্য হি রসাদয়ঃ।" কিন্তু সে পরের বিচার। ভোগে তোমার দেশ নেই, কালও নেই। এই জন্য কাব্য সম্ভোগ 'পরব্রহ্মস্বাদসচিবঃ'। গ্রীক দার্শনিকের Aesthetikos-এর প্রকাশহীন অনুভূতির ব্যঞ্জনা আর ভারতের রসের বীক্ষণ, তুল্য কোটির বলে মনে হয়। ইরাণী ময়মী এ অবস্থায় সচেতন ব্যাখ্যা প্রবৃত্তিকে পরিহাস করে বলবেন—"খামোশ"—রসভঙ্গ করোনা। জান তর্ করা রসে শুধু পেয়ালা ভরো—কথাটি ব'লো না।—

ইরানের প্রসঙ্গ শেষ করে 'প্রতীচী ও প্রাচী'—এই দুই প্রান্তের দুই আর্যশাখার শিল্পতত্ত্বের পরিচয় দিই। গ্রীসের শিল্পতত্ত্বেও জীবনে শিল্পের

প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কম বিবাদ বিসংবাদ হয় নি। এই বিবাদের প্রসিদ্ধ প্রবক্তা স্বয়ং প্লাতোন (Plato)। প্লেটোর মতবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে বুঝতে পারি প্লেটোর মন নির্দ্বন্দ্ব নয়। তিনি যাকে হৃদয়ে পোষণ করেন, তাকে জীবনে গ্রহণ করতে পারেন না। এ এক বিচিত্র কৌতুক। দুর্বাসার শাপে অভিশপ্ত দুষ্মন্ত তাঁর বিস্মৃতির কুয়াশায় তাঁরই সম্মুখে উপস্থিত, তাঁরই বধূ শকুন্তলায় রূপে মুগ্ধ হ'য়েও ফিরে ফিরে আসেন। এ যেন তুষারে ঢাকা কুন্দ কুসুম, ভ্রমর এগিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে—

"ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি, প্রথম পরিগৃহীতং
স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং, ন চ খলু পরিভোক্তুং
নাপি শক্নোমি হাতুম্॥"

প্লেটো সেই দোলাচলচিত্তবৃত্তি লুব্ধ ভ্রমর। Will Durant বলেছেন—"The philosopher aud the poet lived in one soul." দার্শনিক প্লেটো আপন আদর্শে সুস্থির, স্বদেশবাসীর সুস্থ জীবনে কবিতার প্রবেশাধিকার দিতে তিনি নারাজ। সে যে জাতির জীবনে শৌর্যের হানি ঘটায়। অন্য দিকে সেই inner soul বা মর্মের কবিমানুষটি কাব্যের আনন্দ-উজ্জ্বল দিকটি কখনো পরিহার করতে পারে না। এ যেন 'চরণ চলে না, চলে' 'শৈলাধিরাজ তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ'। তিনি যে কাব্য বা কবিদের তাঁর আদর্শ রাজ্যে রাখতে পারেন না, সে তো Republic নামক মহাগ্রন্থের সূচনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা; কিন্তু Plato কি তাদের ছাড়তেও পেরেছেন? যে ভাষায় তিনি কবিদের নির্বাসিত করেছেন, সে ভাষার কি দীপ্তি! প্রকাশে কি দিব্য সৌরভ! মন মণ্ডল হয়ে ওঠে। মূল সঙ্গীতময় গ্রীক ভাষায় পরিচয় দিতে পারব না। অনুবাদেও সে ভাষায় দ্যুতি ও সঙ্গীত অতুলনীয়। কবির কবি Shelley-র কথাতেই বলি না কেন?

"Plato exhibits the rare union of close and subtle logic with the pythian enthusiasm of poetry, melted by the splendour and harmony of his periods into one irresistable stream of musical impressions, which hurry the persuasions onward as in a breathless career."—Quoted in the Story of Philosophy —W. Durant, page 21.

কবির স্বপ্ন, কবির ভাবাবেশ—সর্বোপরি মধুলুব্ধ মধুকরের কলগুঞ্জিতের

মত যে কাব্য ভাষা—সে সম্বন্ধে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন এবং সক্ষম। কিন্তু তিনি জানেন, ললিতকলায় একটা জাতি ক্রমশ ক্ষয়ের পথে চলে যায়। তার নজির ইতিহাসে আছে—আর ইতিহাস বার বার ফিরে ফিরে আসে। Sparta-র কাছে Athens পরাজিত হয়েছিল। H. G. Wells তাঁর Outline of History নামক বিখ্যাত মহাগ্রন্থে বলেছেন—দুর্ধর্ষ যাযাবররা যুগে যুগে বিজয়ী হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার পর, অবসর পেয়ে শিল্পী হয়ে উঠেছে; তার পর আর একটা যাযাবর জাতির দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছে। আবার তাদের ভাগ্যেও কালক্রমে অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে। 'সৌন্দর্যই শূরত্বের মৃত্যুগীত গায়'। তাই বুঝি জাতির স্বার্থে স্বজাতির Eugenics বা জীবনরসায়ন সম্মুখে রেখে সেই জাতকবিটির অমন অকবির মত কথা বার বার বলতে হয়েছে।

প্লেটোর কবি-নির্বাসনের যুক্তিগুলির মধ্যেই প্লেটোর কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ ব্যাজস্তুতির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। প্লেটো বলেন, সাহিত্যে আদর্শের প্রতিচ্ছবি নেই। আছে আদর্শের অনুকরণের অনুকরণ। এই প্রসঙ্গে প্লেটোর মাইমেসিস (mimesis) বা অনুকরণ তত্ত্বটি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সৃষ্টিই তো প্রথম অনুকরণ। স্রষ্টার আদর্শ অর্থাৎ তাঁর মনের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিতে প্রথম অনুকৃত হলো। কাব্যকার, নাট্যকার, চিত্রকর, কলাকর আবার সেই অনুকৃতির অনুকরণ করলেন। সেটা মূল সত্য থেকে (idea-ই মূল সত্য) বহুদূরে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এই impersonation বা অনৃত অভিনয়ের মূল্য কতটুকু? এই জন্য Republic-এর দশম খণ্ডে তিনি সাহিত্য ও শিল্পকে মিথ্যা মায়াচার বলেছেন। এই জগতের বাইরে যে একটা পূর্ণের আদর্শ আছে—বস্তুরূপে, ক্রিয়ারূপে, অবস্থারূপে, সেই আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে এসে শিল্পজগৎ সত্যহীন, অর্থহীন; অথচ সেই কাব্যজগৎ মুহূর্তগুলনে মানুষের সুস্থ সবল স্নায়ুতন্ত্রে এক কর্মনাশা ব্যাধির সৃষ্টি করে। এই ব্যাধি জাতীয় জীবনকে দুর্বল ক'রে পঙ্গু ক'রে বিনষ্ট ক'রে দেয়। বহির্বিশ্বের সেই সত্য সুন্দর জগৎ সম্বন্ধে Plato যা বলেন তা হচ্ছে এই—

"Behind the surface phenomena and particulars which greet our senses, are generalisations, regularities and directions of development unperceived by sensation but conceived by reason and thought. Those ideas, laws and ideals are more permanent and therefore more real than the sense-percived particular things through which we conceive and deduce them—(Plato—by Will Durant)

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছিলেন,—

'কোন বিশ্ব পারে
আছে তব জন্মভূমি ? সঙ্গীত তোমার
কত দূর নিয়ে যাবে, কোন কল্পলোকে ?'

এবং বিশ্বাস ক'রেছিলেন—'আছে এক মহাউপকূল এই সৌন্দর্যের তটে'। পার্থক্য এই—Plato যাকে চিন্তা এবং যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, কবি তাকে শুধু হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন ; যুক্তি দিয়ে বুঝাতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছিলেন। আবার পূর্বের কথায় ফিরে এসে বলি—কবিতার গ্রহণ এবং বর্জনেও প্লেটো আর একবার দোলায়মান। তিনি বলেন দেবতারা চিরকাল আদর্শ ; সুতরাং অমরধামের দেবস্তুতিতে দোষ নেই। মরধামের অমরকল্প মহামানবদের জয়গানও চলতে পারে ; কিন্তু অসতের নাট্যানুকরণ নৈব নৈব চ। কাজেই যেখানে উৎকর্ষ দেদীপ্যমান, সৌন্দর্য স্বতনিষ্কন্দী, প্লেটোর ভাষায়, যেখানে আছে Kalos, সাহিত্যে সেই কালোস বা শিবসুন্দরের উপাসনায় দোষ নেই।

ভূমণ্ডলের এই পূর্ববিভাগে—এই আমাদের ভারতবর্ষেও কি গ্রহণ বর্জনের সেই একই চিন্তাধারা একদা সমাজরক্ষী ও সাহিত্যমীমাংসকদের ভাবিত ক'রে তোলে নি ? সদাজাগ্রত সমাজরক্ষীরা বলেছেন—শাস্ত্রই শাসন করে, শাস্ত্র দ্বারাই সমাজ জীবন শাসিত হোক। কাব্য এনে সব বিশৃঙ্খলা ক'রে দিও না। সুস্থ, স্বাভাবিক নিয়মানুগত জীবনে কাব্য আনে বিশৃঙ্খলা। মানুষ তখন আর আদর্শ মানতে চায় না। 'কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রম্'। কাব্য মানুষের সংযত বুদ্ধিতে আনে অসংযমের বিষ। সুতরাং সেদিন শাস্ত্রায়ুধে সজ্জিত পণ্ডিতমণ্ডলী উদ্যত তর্জনী সঙ্কেতে বলেছিলেন—কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ। তার জের বুঝি বহুদিন চলেছিল। সেই জন্য মাত্র সেদিনের ওই চতুর্দশ শতকের প্রখ্যাত কাব্য-ব্যাখ্যাকার মহোপাধ্যায় মল্লিনাথকে সব কাব্য ব্যাখ্যার প্রারম্ভেই অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে পদক্ষেপ করতে হয়েছিল। তিনি বলতেন, আমি কাব্যসমূহের ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে অগ্রসর হচ্ছি এই জন্য যে, কাব্য শ্রেয়ঃসাধন এবং ওই যে 'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জয়েৎ' সে নিষেধ অসৎকাব্য-বিষয়ে। মল্লিনাথের সভারোহণের পূর্বেই এই প্রকার বর্মপরিধান সত্যই আজ কৌতুক সৃষ্টি করে—যেন আমরা দেখি প্লেটোর গ্রীসের এক টুকরো ভারতের এক খণ্ডাংশের সঙ্গে সাযুজ্য ধারণ ক'রে বসে আছে।

প্লেটো তাঁর 'Phaedrus' (268 BC)-এ বলেছেন—Mantike ও

Manike—এ দুয়ের মধ্যে অর্থাৎ প্রতিভাবান ও উন্মাদের মধ্যে ভারী এক আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। কথাটা প্রণিধান যোগ্য। উন্মত্তে বিশৃঙ্খল উন্মাদনা, আর প্রতিভায় সে উন্মাদনা সুশৃঙ্খলিত। একটায় আনন্দ উদ্দাম, অপরটায় দান্ত। একজন রসিককে একদা বলতে শুনেছিলুম—"Eccentricity successful is genius and unsuccessful is insanity."—উৎকেন্দ্রিকতা সফল হলেই 'প্রতিভা' এবং বিফল হলেই পাগলামি। ইরাণী কবি আবুল হাসান শহীদ রলখী এক জায়গায় বলেছেন—ধোঁয়া হলেও আগুন জলে ওঠে—এই হলো ধূমের সফল পরিণাম, না হ'লে সবই অন্ধকার, সবই ঘম., সবই বিষাদ।

আগর গ. ময়া চুঁ আতশ দূদ বুদে।
ঈঁা তারী বুদে জাবেদানী॥

উন্মত্ততায় ও প্রতিভায় এই ছাড়া পার্থক্য নেই। একটা ধোঁয়া, আর একটা আগুন। উৎকৃষ্ট কবি সর্বদাই অনুপ্রাণিত। কবি কেন? শিল্পীমাত্রই সৃষ্টির পূর্বে অনুপ্রেরণা অনুভব করেন। অলস মুহূর্তে কোন সর্জনা নেই। চিরকালীন কবিরা একটা দিব্যভাবের আবেগ অন্তরে অনুভব করেন। এই ভাবাবেগ থেকেই শিল্পের জন্ম ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ভাল করেই তাঁর ব্যক্তিজীবন বুঝে নিয়ে বলেছিলেন—"হেথা আমি কেহ নই—সহস্রের মাঝে একজন।" কিন্তু ওই স্পর্শমণির স্পর্শেই তিনি বলে ওঠেন—"তুমি মোরে ক'রেছ সম্রাট।" The Poet is possessed। অপ্রমত্ত ক্রান্তদর্শী Homer 'Odyssey' মহাকাব্যে Tiresias এর কাহিনী বলেছেন। Thebes এর এই মানুষটি ছিল অন্ধ, কিন্তু দিব্য প্রেরণা তাঁকে প্রজ্ঞার চক্ষু দিয়ে যেতো। কবি জীবনের অন্তিম পর্যায়ে অন্ধ কবি Miltonও বলেছিলেন—"Still guide the heavenly vision." ভারতের সুরদাস বলেছিলেন 'জনমহি তে হুঁ নৈন বিহীনা'; কিন্তু দিব্যানুভবের প্রজ্ঞাচক্ষু তাঁদের কে অস্বীকার করবে? সবই ঠিক; কিন্তু কবির প্রেরণা ধ্যানে সংযত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য কবিমনের উৎকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে—পরবর্তী যুগে সাহিত্য-সমালোচক রোমান Horace-কে এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করতে হয়েছিল। Plato এবং তাঁর শিষ্য Aristotle উভয়েই Mantike ও Manike নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করেছিলেন। Ars Poetica গ্রন্থের সিদ্ধান্ত হচ্ছে—কবি হবেন সর্বদাই বিবেকবুদ্ধিসমিত এবং কবিতা হবে সংযতশিল্প। (ক্রমশঃ)

অশান্ত পাঞ্জাব

অন্নদাশঙ্কর রায়

এমন যে কখনো হতে পারে আমরা কেউ কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। পাঞ্জাব জুড়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলেছে, মরছে যারা তারা নিরস্ত্রীকরণ শিখ বা হিন্দু। মারছে যারা তারা অকালী শিখ বা আরো উগ্র খালিস্তানপন্থী শিখ। রাজ্যের পুলিশ থামাতে পারছে না, কেন্দ্রের পুলিশ থামাতে পারছে না, পুলিশকেই মেরে পার পেয়ে যাচ্ছে, দুর্গ বানিয়েছে ও অস্ত্রাগার ভরেছে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের নিরাপদ আশ্রয়ে। যেখানে পুলিশের ও মিলিটারির প্রবেশ নিষেধ।

উগ্রপন্থীদের তো সাতখুন মাফ, অকালী দলও সঙ্গে সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের নয়া কর্মপন্থা রাজ্য থেকে শস্য চালান হতে না দেওয়া। শস্য জমুক আর পচুক, অন্যান্য রাজ্যের লোক খেতে না পেয়ে মরুক। ক্ষেত-খামারে কাজ করার জন্যে বিহার থেকে বা উত্তরপ্রদেশ থেকে যেসব দিনমজুর এসেছে তাদের তাড়াতে হবে। চাষের ক্ষতি হয় হোক। যেন তারা ভারতীয় নাগরিকই নয়, তাদের নাগরিক অধিকারই নেই। অথচ ভারতের সর্বত্র পাঞ্জাবী শিখদের নাগরিক অধিকার থাকবে।

ভারত সরকার প্রত্যাশা করেছিলেন যে অকালী শিখদের চক্ষুশূল দরবারা সিং সরকারকে সরালে শান্তি সুগম হবে। তাই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন করেন। কিন্তু তাতেও অবস্থার উন্নতি হলো না, বরং আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে মনে হলো। তখন বাধ্য হয়ে মিলিটারি পাঠাতে হলো, কিন্তু মিলিটারিই বা কি করতে পারে, যদি একদল জঙ্গী শিখ স্বর্ণমন্দিরে তাদের নিরাপদ ঘাঁটি বানায় ও সেখান থেকে বাইরে এসে হানা দিয়ে আবার সেইখানেই পালায়। ঘাঁটি দখল করা একটা মিলিটারি নেসেসিটি। না করলে মিলিটারিকেও রাজ্যের পুলিশ তথা কেন্দ্রের পুলিশের মতো ব্যর্থ হতে হবে। পৃথিবীতে

প্রবন্ধটি ইন্দিরাগান্ধী হত্যার আগেই লেখা হয়েছিল। ফলে ঐ হত্যার পরবর্তী ঘটনার উল্লেখ এতে নেই। তবে পাঞ্জাবের যে মৌলিক সমস্যা তার পরিবর্তন আজও ঘটেনি। সে কারণেই রচনাটি এখনো প্রাসঙ্গিক।

সম্পাদক—আলেখ্য।

এমন কোন্ গভর্নমেন্ট আছে যে আর একটা সমান্তরাল গভর্নমেন্ট চলতে দেবে? এমন কোন্ গির্জা বা মসজিদ বা মন্দির আছে যেখানে কোনো অবস্থাতেই পুলিশ বা মিলিটারি প্রবেশ করতে পারবে না, থানাতল্লাসি বা ধরপাকড় করতে পারবে না? খ্রীষ্টীয় চার্চ আগেকার দিনে এ রকম দাবী করত, কিন্তু ইতিমধ্যে তার একটা ফয়সালা হয়েছে। অপরাধীদের সে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে অপরাধ চালিয়ে যেতে দেয় না। পুলিশের হাতেই সমর্পণ করে। মুসলমানদের পবিত্রতম মসজিদ কাবা শরিফে যেসব সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটি করেছিল তাদের উচ্ছেদ করার জন্যে সৌদীআরব সরকার সৈন্য পাঠান। তারা নিহত হয়।

উগ্রপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে উভয় পক্ষেই বহু লোক হতাহত হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন সন্ত ভিন্দ্রানওয়ালে। ইনিই উগ্রপন্থীদের সর্বাধিনায়ক। খালিস্তান সম্ভব হলে ইনিই হতেন তার আয়াতোল্লা খোমেইনী। এঁর হিন্দুবিদ্বেষ শিখ-ইতিহাসে অভাবনীয়। এর হুকুমে বহু হিন্দুর প্রাণ গেছে। তাই ইনি সদলবলে নিহত হয়েছেন শুনে রাজ্যের হিন্দুরা নাকি মিষ্টান্ন বিতরণ করে। এঁদের আশ্রয়স্থল অকাল তখ্‌ত্‌ও বহুপরিমাণে বিনষ্ট হয়। সমগ্র শিখ সমাজ শোকে মুহ্যমান। অকাল তখ্‌ত্‌ সারানোর জন্যে সরকার সচেষ্ট। দায়িত্ব নিয়েছেন যিনি তিনিও শিখ। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শিখ তাঁর ডাকে সাড়া দিলেও আরো লক্ষ লক্ষ শিখ বিপক্ষে। অকাল তখ্‌তে সংরক্ষিত ছিল চার পাঁচ শতাব্দীর পুরাতন পুঁথিপত্র, গুরুদের হস্তলিপি। সব পুড়ে ছাই। পুনরুদ্ধার অসম্ভব।

ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার হৃদয় এখন শিখদের সঙ্গে। শিখরা এক ধার থেকে সকলেই বজ্রাহত, বিচলিত ও ক্ষুব্ধ। শুধু যে অকালীরা স্তব্ধ তা নয়। রক্ষা এই যে, হরিমন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অক্ষত রয়েছে। দৈনিক উপাসনায় ব্যাঘাত ঘটেনি। কর্তৃপক্ষ সেদিকে হুঁশিয়ার ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল উগ্রপন্থীদের সমূলে উচ্ছেদ করা। তারা যদি বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করত তা হলে তারাও বাঁচত, অকাল তখ্‌তের গায়ে আঁচড়টিও লাগত না। কিন্তু তাদের প্রস্তুতিটাই যুদ্ধবিগ্রহের। সেটা এমন এক কেন্দ্র থেকে যেটা অপর পক্ষের সৈন্যদের নাগালের বাইরে। ধর্মস্থানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে লাগানোর সুযোগ না থাকলে তারাও ভারত সরকারের সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে লড়তে সাহস পেতো না। সেইজন্যে যেসব প্রশ্ন মনে জাগছে তার মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হলো, কোনো সভ্য দেশে কি

ধর্মস্থানকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়? যদি না হয় তো এ দেশেই বা হতে দেওয়া হবে কেন! অকালীরা যদি রাজনৈতিক আন্দোলন করতে চায় তো বাইরে এসে করুক। আর সবাই যেমন করছে। এত বড়ো যে স্বাধীনতা আন্দোলন তা তো হিন্দু মন্দির বা মঠবাড়ী থেকে হয়নি। হয়েছে গান্ধীজীর আশ্রম থেকে। সেটা ধর্মস্থান নয়। সেখানে কোনো দেবদেবী ছিল না, তাঁদের পূজা অর্চনাও হতো না। যেটা হতো সেটা সর্বজনীন উপাসনা। সব ধর্মের লোক যোগ দিত। গান্ধীজীর আশ্রমের বাইরে আন্দোলনের বহু কেন্দ্র ছিল। কোনোটাই ধর্মস্থান নয়। আন্দোলনটা ধর্মনিরপেক্ষ। তবে ধর্মবর্জিত নয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতারা কেন শিখ সন্ত? উগ্রপন্থীই হোন আর নরমপন্থীই হোন সকলেই এক একজন সন্ত। যেমন ভিন্দ্রানওয়ালে তেমনি লঙ্গোয়াল। এখন দেখছি হরিমন্দিরের পুরোহিতরাও নেতৃত্ব করতে উদ্যত। আন্দোলনটা যদি ধর্ম নির্বিশেষে রাজ্যের অধিবাসীদের স্বার্থেই হতো তবে হিন্দুরাও এতে যোগ দিত, অন্তত তাদের জন্যে দরজা খোলা থাকত। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এটা শিখদেরই সাম্প্রদায়িক স্বার্থে। সম্প্রদায়কেই বলা হচ্ছে নেশন। অবিকল মুসলিম লীগের মতোই উক্তি। ওঁদের মতে মুসলমানরা একটা নেশন। ওঁরা দাবী করেছিলেন মুসলিম নেশনের জন্যে তাঁদের হোমল্যাণ্ড। এঁরা দাবী করছেন শিখ নেশনের জন্যে এঁদের হোমল্যাণ্ড। আমার হাতের কাছে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট প্রকাশিত 'ট্রান্সফার অভ পাওয়ার' নামক গ্রন্থ আছে। তাতে ক্যাবিনেট মিশনের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ক্যাবিনেট মিশনের জিজ্ঞাসার উত্তরে শিখ নেতারা বলেন, তাঁরা চান সংযুক্ত ভারত, তাতেই তাঁরা তাঁদের সংখ্যালঘুর অধিকার পাবেন। কিন্তু ভারত যদি ভাগ হয় তবে তারা পাকিস্তানে যাবেন না, হিন্দুস্থানেও যাবেন না, থাকবেন শিখিস্থানে বা খলিস্থানে। কিন্তু কোথায় সেই শিখিস্থান বা খালিস্থান হবে! এমন জেলা কি একটিও আছে যেখানে শিখদের সংখ্যা শতকরা পঞ্চাশের বেশী? জেরায় জবাবে তাঁরা বলেন, না, তেমন জেলা একটিও নেই, লোকবিনিময়ের দ্বারা কয়েকটি জেলাকে শিখপ্রধান জেলায় পরিণত করতে হবে। ব্রিটিশ কর্তারা তাতে নারাজ হন। শিখদের সামনে তিনটি নয়, দুটি বিকল্প রাখা হয়। হিন্দুস্থান বা পাকিস্থান। দুটির একটিকে বেছে নিতে হবে। তাঁরা হিন্দুস্থান বেছে নেন। হিন্দুরা তাঁদের ডাকেনি, বাধ্য করেনি। তাঁরা স্বেচ্ছায় চোখ কান খোলা রেখে হিন্দুস্থানেই

যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একবার হিন্দুস্থানে যোগ দেবার পর, পরে বিচ্ছেদের জন্যে আন্দোলন করা চলে না।

কিন্তু এই সাঁইত্রিশ বছরে সেই দাবীর মূলে একটা শক্ত বনিয়াদ তৈরি হয়েছে। সেটা কয়েক জেলায় শিখ সংখ্যাধিক্য। সেই সংখ্যাধিক্যের অস্তিত্ব থাকলে পার্টিশনের সময়েই শিখিস্থান বা খালিস্থান সম্ভব হতো। মুসলমানদের মতো শিখদের উপরেও ইংরেজদের স্নেহদৃষ্টি ছিল। তা বলে ওঁরা তাঁদের বেয়োনেটের জোরে লোকবিনিময় ঘটাতে রাজী হতেন না। তাতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বাধা দিত। কিন্তু তাঁদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই আপনা থেকে বা মায়ের চোটে হিন্দু মুসলমানের লোকবিনিময় ঘটে যায়। একই কালে শিখ মুসলমানেরও। পশ্চিম পাঞ্জাব হিন্দুশূন্য তথা শিখশূন্য হয়ে যায়। পূর্ব পাঞ্জাব মুসলিমশূন্য হয়ে যায়। এটা কি নেতারা কেউ চেয়েছিলেন? না, তাঁরাও ভাবতে পারেননি। না জিন্না, না নেহেরু, না বলদেও সিং। তবে এর পেছনে জনা কয়েক প্রতিদ্বন্দ্বী নেতার হাত ছিল বলে শোনা যায়। তার চেয়ে বড়ো কথা যারা পালিয়ে আসে বা যায়, তারা যেখানে ছিল সেখানে তাদের ভবিষ্যৎ নেই এটা অনুমান করেই অমন সিদ্ধান্ত নেয়। ইউরোপের ইতিহাসে এর বহু নজীর আছে, কেবল মধ্যযুগেই নয়, বর্তমান যুগেও। সেকালে তার মূলে ছিল ধর্মের জুলুম। একালে মতবাদের জুলুম। কিংবা আধামির জুলুম। ইহুদীরাও প্যালেস্টাইনে গিয়ে আরবদের তাড়িয়েছে রেসিয়াল সংখ্যাধিক্য স্থাপনের জন্যে। আমাদের ধারণা ছিল ভারতের ইতিহাসে অমন কোনো অন্যায় ঘটবে না। আমাদের আশা ছিল যে যার নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বাড়ীঘর ফিরে পাবে, প্রতিবেশীরা অভয় দেবে, সরকারে সরকারে মিটমাট হবে। দুঃখের বিষয় উল্টোরথের দেখা নেই। কেউ ফিরে যায়নি।

উল্টে যেটা দেখা গেল সেটা নতুন বাসভূমিটাকেই শিখ সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে পাঞ্জাবী ভাষাভিত্তিক রাজ্যে পরিণত করা, তার জন্যে হিন্দীভাষী হরিয়ানাকে বাদ দেওয়া, একটি না দুটি জেলাকে হিমাচলপ্রদেশভুক্ত করা। তা সত্ত্বেও শতকরা আটচল্লিশ জন হিন্দীভাষী থেকে গেল পুনর্গঠিত পাঞ্জাবে। তারাও পাঞ্জাবী, অথচ পাঞ্জাবীভাষী বলে পরিচয় দেয় না, নিজের মাতৃভাষাকে ছেড়ে হিন্দীভাষাকে বরণ করেছে। শিখদের চোখে এটা একটা অমার্জনীয় অপরাধ। যাদের সঙ্গে ধর্মের বন্ধন ছিল না তাদের সঙ্গে ছিল ভাষার বন্ধন। সে বন্ধনও যদি কেউ কাটিয়ে যায় তবে সে তো স্বেচ্ছায় পর হয়ে গেল। মজা

হচ্ছে, বাড়ীতে সকলেই পাঞ্জাবী ভাষায় কথা বলে, কিন্তু বাইরে তাদেরই শতকরা আটচল্লিশ জন হিন্দীভাষী। সমস্যাটাকে আরো জটিল করেছে গুরুমুখী লিপি বনাম দেবনাগরী লিপি। শিখরা গুরুমুখী লিপিতে লেখে ও পড়ে। হিন্দুরা দেবনাগরী লিপিতে লেখে ও পড়ে। আগেকার দিনে শিক্ষিত হিন্দু শিখ মুসলমান সকলেই উর্দুতে লিখত ও পড়ত। সেটা এখন কেবল পাকিস্তানেরই রীতি।

এই যে স্বখাত সলিল এর থেকে কে এদের বাঁচাবে? আক্ষরিক অর্থে হিন্দু শিখ ভাই ভাই বহু পরিবারে। আমার ছেলেবেলায় আমার জন্মস্থানে এক পাঞ্জাবী ফরেস্ট অফিসার ছিলেন, নাম পৃথ্বী চাঁদ। তিনি হিন্দু। কিন্তু তাঁর পুত্র শিখ। তাঁদের পুত্র বলদেও সিং আমাদের স্কুলে পড়ত, আমাদের সঙ্গে খেলত। সে শিখ। ধর্ম আলাদা হলেও সাধারণত উভয়পক্ষের কাস্ট এক। একই কাস্ট সিস্টেম শিখ আর হিন্দুকে বেঁধে রেখেছে, তাই দুই সম্প্রদায়েই তফসিলী জাত আছে। সংবিধানে হিন্দু ও শিখকে বন্ধনীভুক্ত করার কারণও তাই।

গুরু গোবিন্দের পূর্বেও আরো নয় জন গুরু ছিলেন। তাঁরা কেউ সিংহ পদবী ধারণ করেননি। কেশ, কঙ্ক, কঙ্কণ, কচ্ছ ও কৃপান এই পাঁচটি 'ক' এর দ্বারা চিহ্নিত হননি। গুরু নানকের বংশধর বাবা পুরুষোত্তম লাল বেদীকে দেখেছি। তিনি ওসব মানতেন না। তাঁর স্ত্রী ক্রীডা ইংরেজ। পুত্র কবীর পরে নাম করা চিত্রতারা হয়। সম্প্রতি সে পাঁচতারা হোটেলের দ্বারা চিহ্নিত না হয়ে জঙ্গী শিখদের পাঁচ 'ক' কেশ ইত্যাদির দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। সিংহ পদবী ধারণ করেছে কি না জানিনে। কিন্তু পূর্ববর্তী নয় গুরুর শিষ্যরাও এখনো বিদ্যমান। তাঁরা কেউ বোধ হয় "সিংহ" নয়। গুরু গোবিন্দের অনুবর্তীদের বৈশিষ্ট্য, তাঁরা খালসা, বা জঙ্গী শিখ। তাঁদের এক হাতে শাস্ত্র, আর এক হাতে শস্ত্র। যেমন মুসলমানদের। তাঁরা মোগলের সঙ্গে লড়েছেন, ইংরেজদের সঙ্গে লড়েছেন। আবার ইংরেজদের হয়ে জার্মানদের সঙ্গে লড়েছেন, ইটালিয়ানদের সঙ্গে লড়েছেন, জাপানীদের সঙ্গে লড়েছেন। কতক আবার আজাদ হিন্দ ফৌজভুক্ত হয়ে নেতাজী সুভাষের নির্দেশে লড়েছেন। এই যে জঙ্গী ঐতিহ্য এটা ভিন্দ্রানওয়ালে ও তাঁর উগ্রপন্থীরা অনুসরণ করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন। কিন্তু ঐতিহ্যটাও তো তাঁদের সঙ্গে নির্মূল হলো না। এই শেষ নয়।

শিখধর্ম গোড়ায় বৈষ্ণবধর্মের মতোই প্রেমধর্ম ছিল, এখনো তার ভিতরটা

সেই রকমই রয়েছে। যুদ্ধ বা রাজনীতি হচ্ছে বহিরঙ্গ। কিন্তু কয়েকটা কথা হিন্দুরা কিছুতেই বুঝবে না। হিন্দুত্বই যদি শেষ কথা হতো তবে শিখত্বের প্রয়োজনই হতো না। হিন্দুদের কাছে বেদ অভ্রান্ত ও অপরিবর্তনীয়। যেমন মুসলমানদের কাছে কোরান ও খ্রীস্টানদের কাছে বাইবেল। তেমনি শিখদের কাছে গ্রন্থসাহেব। শিখরা বেদের অথরিটি মানে না। সেইজন্য আর্যসমাজীদের সঙ্গে তাদের বিরোধ। আরো আগে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে। শিখরা আবার আর্যসমাজীদের মতো একেশ্বরবাদী তথা নিরাকারবাদী। তাদের মন্দিরে দেবদেবীর মূর্তিকে স্থান দিয়েছিলেন হিন্দু মোহন্ত পরম্পরা। মোহন্ত সমেত সেসব বিদায় করে দেন অকালী সংস্কারকদল। সেই থেকে অকালীদেরই সর্বময় ক্ষমতা। ষাট বছর ধরে তারা সেই ক্ষমতা ভোগ করে এসেছেন। রাজনীতি ও সামরিকতা তাঁদের কাছে নিশ্বাস প্রশ্বাস। স্বাধীন ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়েছে বলে তাঁরা তাঁদের নিশ্বাস প্রশ্বাস ভুলতে পারেন না।

তা ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রও কি হিন্দুরা সকলে মেনে নিয়েছে? নেতারা কেউ বা যাচ্ছেন শঙ্করাচার্য দর্শনে, কেউ বা তিরুপতি তীর্থে গিয়ে বেঙ্কটেশ্বরের আশীর্বাদ নিচ্ছেন, একজন রাজ্যপাল তো মাথাও কামিয়েছেন, ধূলায় গড়াগড়িও দিয়েছেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। কী চমৎকার আচরণ! কী চমৎকার শিক্ষা! অত্যন্ত প্রভাবশালী একটি সঙ্ঘ সারা দেশ জুড়ে হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। যেখানেই যায় সেখনেই অহিন্দুদের মনে আতঙ্ক জাগায়, দাঙ্গা বাধায়। হিন্দু রাষ্ট্রে কি অহিন্দু থাকবে না? চেপে ধরলে বলে, থাকবে। হিন্দু অর্থে হিন্দু নামক দেশে যারা থাকে তারা ধর্মনির্বিশেষে সবাই হিন্দু। রাষ্ট্র শব্দটার বাংলায় এক অর্থ, হিন্দীতে আরেক। বাংলায় রাষ্ট্র বলতে বোঝায় ইংলণ্ড, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি রাষ্ট্র। হিন্দীতে বোঝায় ইংরেজ, আমেরিকান, জাপানীর মতো একটি নেশন। অর্থাৎ হিন্দুরাও ইংরেজদের মতো একটি নেশন। অহিন্দুরাও তার সামিল। এর প্রতিবাদে মুসলমানরা ইতিমধ্যেই পাকিস্তান হাসিল করে নিয়েছে। এর প্রতিবাদে শিখেরা যদি শিখিস্থান বা খালিস্থান আদায় করে নিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তবে তাদের বাধা দিতে পারি, নিরস্ত্র করতে পারি, কিন্তু নিরস্ত করব কী করে?

হিন্দুদেরই মনটাকে পরিষ্কার করতে হবে। হিন্দুরা একটা নেশন নয়, তারা ভারতীয় নেশনের একটা অংশ। এটা হিন্দু রাষ্ট্র নয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। শিখরা স্বতন্ত্র একটি ধর্মসম্প্রদায়, যেমন মুসলমানরা, যেমন খ্রীস্টানরা। হিন্দুদের

সঙ্গে তাদের নিকট সম্পর্ক, বিয়ে সাদী চলে, কিন্তু পূজা পার্বণ এক নয়, বিবাহাদির রীতকর্মও এক নয়। শিখরা মুসলমানকেও শিখ করে নেয়, সমান পবিত্র মনে করে। হিন্দুরা তা করে না। মুসলমানকে মনে মনে অপবিত্র জ্ঞান করে। মুখে ভাই ভাই বলে। শিখদের মন্দিরে মুসলমানদেরও অবাধ প্রবেশ, হিন্দুদের মন্দিরে তো তথাকথিত অস্পৃশ্যদেরই প্রবেশ নেই। অমৃতসরের হরিমন্দিরের ভিত্তিশিলা স্থাপন করেন এক মুসলিম সন্ত। মুসলমানদের সঙ্গে গুরু নানকের মধুর সম্পর্ক ছিল। তিনি তো মক্কায়ও গেছলেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরেও গেছলেন। গ্রন্থসাহেবে হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি সর্ব ধর্মের স্তব সংগ্রহ করা হয়েছে।

এই সম্প্রদায়কে ভারতীয় নেশনভুক্ত করতে চাইলে হিন্দু নেশনের মোহ ত্যাগ করতে হবে। আর একটি মোহ সকলের উপর হিন্দী ও দেবনাগরী চাপানো। তা নইলে নাকি সংহতি হবে না। কেন হবে না! সংহতি কি সুইটজারল্যাণ্ডের নেই? বেলজিয়ামের নেই? কানাডার নেই? এত ঠুনকো যদি হয় আমাদের সংহতি তবে একে রক্ষা করবে কে? কোন্ মন্ত্রবলে? শেষপর্যন্ত সর্বত্র মিলিটারি শাসনই চাপাতে হবে। কিন্তু ভারতের সৈন্যদলে বিস্তর অহিন্দু ও তাদের অসামান্য প্রভাব। সেটা সত্যিই ধর্ম-নিরপেক্ষ। মিলিটারি রুল হলে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনই হবে। তা বলে আমি মিলিটারি রুলকে স্বাগত করব না। সংবিধানকেই সযত্নে পাহারা দেব। সেই আমাদের সংহতির বর্ম। শিখদেরও আপনার করতে হলে হিন্দু ধর্মের বন্ধনে নয়, ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের বর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। সংবিধানের বাইরে না গিয়ে হিন্দু নেশন, হিন্দী ন্যাশনাল ভাষা, দেবনাগরী ন্যাশনাল লিপি এসব তত্ত্ব বর্জন করতে হবে। হিন্দী অফিসিয়াল ভাষা হতে পারে, কিন্তু ন্যাশনাল ভাষা নয়। হিন্দী ন্যাশনাল ভাষা হলে তামিলও ন্যাশনাল ভাষা, তেলেগুও ন্যাশনাল ভাষা।

হিন্দু বলে পরিচয় দিতে শিখদের আপত্তি যেমন প্রবল, হিন্দীকে প্রাধান্য দিতেও তেমনি প্রবল আপত্তি। দেবনাগরী সম্বন্ধেও একই কথা। তাদের আশঙ্কা হিন্দীর চাপে পাঞ্জাবী জখম হবে, দেবনাগরীর চাপে গুরুমুখী খতম হবে। তাদের বৈশিষ্ট্য লোপ পেলে তারা হিন্দুত্বের সমুদ্রে বিলীন হবে। যেমন হয়েছে বৌদ্ধরা। সেটা হিন্দুদের দিক থেকে পরম কাম্য হতে পারে, শিখদের দিক থেকে মহানির্বাণ। খলিস্থান না হোক, এমন কিছু হোক যা শিখদের চোখে পাতিয়ালা, কপুরথালা প্রভৃতি শিখশাসিত দেশীয় রাজ্যের

সমান। যার কাশ্মীরের মতো স্পেশাল স্টেটাস। তার কমে তারা শান্ত হবে না। এই অশান্তি লেগেই থাকবে। সীমান্তে অশান্তি কি ভারতের পক্ষে নিরাপদ? সৈন্যদলেও কি সে অশান্তি প্রবেশ করবে না? সময়ে মিটমাট না করলে খলিস্থানের দাবী আরো প্রবল হবে, ও নিয়ে আরো রক্তপাত হবে। বলা বাহুল্য শিখদের সঙ্গে মিটমাটের অর্থ অকালীদের সঙ্গে মিটমাট, যেমন মুসলমানদের সঙ্গে মিটমাটের অর্থ মুসলিম লীগের সঙ্গে মিটমাট। অকালীদের উপেক্ষা করে আর কারো সঙ্গে মিটমাট ধোপে টিকবে না। মুসলিম লীগের মতো ওরা এখনো সম্পূর্ণ ভারতবিমুখ হয়নি। এখনো সময় আছে।

পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ে পাকিস্তানের যে দোটানা হয়েছিল এখন পাঞ্জাবকে নিয়ে অনেকটা সেইরকম দোটানা। সময়ে মিটমাট করলে পূর্ব পাকিস্তান একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত না। ক্ষমতার পুনর্বণ্টনের পর পাকিস্তানেই থাকত। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অনুসরণে সিন্ধুপ্রদেশও ছয় দফা দাবী পেশ করত। তার পরে বা আগে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ফেডারেশনের জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না। পাঞ্জাবীদের পক্ষে সেটা ছিল একটা সর্বনেশে প্রস্তাব। তাঁরা সামরিক সমাধানই পছন্দ করেন। কিন্তু চৈনিক বা আমেরিকান সাহায্য এসে পৌঁছবার আগেই মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা পায় ভারতীয় সাহায্য। সেটা ভূগোলের কৃপায়। পাকিস্তানের পশ্চিমভাগ থেকে পূর্ব ভাগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বাকী স্থান নিয়েই পাকিস্তান পুনর্গঠিত হয়। পাঞ্জাবীরা আরো জবরদস্ত হয়, সিন্ধী ও পাঠানরা আরো কমজোরী। ভুট্টোর মালুম ছিল না তিনি কাদের খেলা খেলছেন। জানলে হুঁশিয়ার হতেন।

আমাদের সামনেও অনেকটা একই রকম দোটানা। শিখপ্রধান পাঞ্জাবকে যদি স্পেশাল স্টেটাস দেওয়া হয়, তবে খ্রীস্টানপ্রধান নাগাল্যাণ্ড ও মেঘালয়কেও কেন নয়? পাঞ্জাবীভাষী পাঞ্জাবকে যদি স্পেশাল স্টেটাস দেওয়া হয় তবে অসমীয়াভাষী আসামকেও কেন নয়? তামিলভাষী তামিলনাড়ুকে কেন নয়? এর পরে তো ওরা এক একটি বলকান রাষ্ট্র হতে চাইবে। সে জলতরঙ্গ রোধিবে কে? ভাবনার কথা বইকি। কিন্তু মনঃস্থির না করলে শিখদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা ক্রমশ আরো কঠিন হবে। যদি না হিন্দু-রাষ্ট্রবাদীদের সর্বগ্রাসী মাকড়সার জাল আপনা থেকে সঙ্কুচিত হয়। হিন্দু ভোটে জয়লাভের আশা যাঁরা রাখছেন তাঁদের অন্তঃপরিবর্তন হবে এটা বোধ হয় মরীচিকা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা মাঝখানে কিছু কমেছিল, আবার

মাথাচাড়া দিয়েছে। পুলিশ দমন করতে পারছে না, কারণ সরষের ভিতরেই ভূত। মিলিটারি পাঠাতে হচ্ছে। এর জন্যে চাই জবরদস্ত কেন্দ্রীয় সরকার। কেমন করে সেই সরকারকে পরামর্শ দিই বিভিন্ন রাজ্যকে স্পেশাল স্টেটাস দিয়ে নিজের ক্ষমতা খর্ব করতে?

অথচ এটাও বুঝি যে, ফেডারেশন হচ্ছে ভারতের মতো বহুধর্মী, বহুভাষী ও বহু রেস্-বিশিষ্ট দেশের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যবস্থা। ফেডারেশনে প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যকে বহু পরিমাণে স্বাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। বিসমার্ক দিয়েছিলেন ক্যাথলিকপ্রধান বাভেরিয়াকে। ছেলেবেলায় আমি দেখতাম একটি পেনসিলের উপর লেখা আছে 'মেড ইন বাভেরিয়া', আরেকটির উপর 'মেড ইন অষ্ট্রিয়া', আবার আরেকটির উপর 'মেড ইন জার্মানী'। যেন তিনটিই স্বাধীন রাষ্ট্র। অনেক বিপর্যয়ের পর অদ্যাবধি ব্যভেরিয়া পশ্চিম জার্মানীর সামিল হয়েও স্বাধিকার ভোগ করছে। একুশ বছর আগে যখন পশ্চিম জার্মানীর অতিথি হয়ে যাই তখন আমাকে কাগজপত্র দেখিয়ে বাভেরিয়া সরকারেরও অতিথি হতে হয়, দু'তিনদিনের জন্যে। ওটা একটা ফর্মালিটি। তা হলেও বাভেরিয়ানদের কাছে মহামূল্য। হিটলার অবশ্য গায়ের জোরে সব স্বাতন্ত্র্য মুছে দিয়েছিলেন, কিন্তু সইবে কেন? অষ্ট্রিয়াও আবার এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। বিসমার্ক সেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রটেস্টানট প্রাসিয়া ক্যাথলিক অষ্ট্রিয়াকে নিয়ে এক নেশন গঠন করতে পারেনি, যদিও ভাষা একই, রেস্ একই।

আমরা ফেডারেশন গড়তে গিয়ে বাধা পাই মুসলিম লীগের দিক থেকে। এখন পাচ্ছি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর দাঙ্গাহাঙ্গামায় অন্তহীন প্রবণতা থেকে। অঙ্গরাজ্যগুলির সঙ্গে কেন্দ্রের যে বন্ধন তা রেশমী সুতোর রাখীবন্ধন। লোহার শিকলের নয়। কেন্দ্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজ্যবিশেষ যদি ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাকে লোহার শিকলে বেঁধে রেখে ডাণ্ডাবেড়ী পরানো সুবুদ্ধি নয়। রাজনৈতিক সমাধান অন্বেষণ করতে হবে। এতদিন সে রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে একটি রাজ্যকে সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্যে সৈন্য মোতায়েন করতে হয়েছে। এটা কি মাসের পর মাস চলতে পারে? বছরের পর বছর? আর প্রেসিডেন্টের শাসনকাল কি সীমাবদ্ধ নয়? ইংরেজ আমলেও সৈন্যদের উপর এত বড়ো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি।

ইংরেজ আমলে আমি যখন জেলা শাসকের পদে নিযুক্ত হই তখন আমার

কনফিডেনশিয়াল বাক্স খুলে দেখি তাতে একটি পুস্তিকা আছে। তাতে নির্দেশ ও উপদেশ দেওয়া হয়েছে কখন কোন্ অবস্থায় মিলিটারিকে ডাকতে হয়। হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যে মিলিটারিকে ডাকলে মিলিটারিই উপরওয়ালা হবে, ম্যাজিস্ট্রেট নয়। মিলিটারি যা করবে তার উপর ম্যাজিস্ট্রেটের কণ্ট্রোল থাকবে না। ম্যাজিস্ট্রেট হবেন সহযোগী বা অধস্তন। সেটা তাঁর পক্ষে সম্মানের নয়। তাঁর প্রেসটিজ হানি হবে। এই পুস্তিকা আমি অন্যান্য জেলাতেও দেখেছি। এটাই সিভিল অফিসারদের গাইড। আমরা মিলিটারি অফিসারদের স্বেচ্ছায় ডাকতুম না। তবে গভর্ণমেণ্ট থেকে পাঠালে কী আর করা যায়। সে রকম উপলক্ষ আমি যতদূর জানি একবারই ঘটেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর সে জেলাকে ঠাণ্ডা করতে। তিন বছর পরে আমি সেখানে জুডিসিয়াল ট্রেনিংএর জন্যে যাই। হানাডাকে সার্কিট হাউসে থাকি। দেখি সেখানে মিলিটারি অফিসারদের অধিষ্ঠান। দিনরাত অস্ত্র হাতে গুর্খা পাহারা দিচ্ছে, আমিও একহিসাবে সপরিবারে নজরবন্দী। প্রাণ হাতে করে, মান হাতে করে তিন মাস কাটাতে হয়। সরকার আমাকে বাসা দিতে পারেন না, আমিও গাছতলায় থাকতে নারাজ। সার্কিট হাউসের সেই অংশটা খালি করে না দিলে আগন্তুক সিভিল অফিসাররা কোথাও উঠতে পারছিলেন না। সরকার আমাকে ঢাকায় পাঠান। আমরাও মিলিটারির খপ্পর থেকে বাঁচি। তবে তাঁরা খুবই ভদ্র।

আমার তো মনে হয় না যে প্রাক্তন আই. সি. এস. অফিসার ভৈরবদত্ত পাণ্ডে পাঞ্জাবের রাজ্যপাল হওয়ার পর মিলিটারির খপ্পরে পড়ে একটুও সুখী হয়েছিলেন। মিলিটারি নিজের প্রয়োজনমতো কাজ করে যায়। সিভিল সায় দিতে বাধ্য হয়। গভর্নরের পোজিশনটা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরই মতো খাটো। পাণ্ডে ইস্তফা দিয়ে বিদায় নেন। নইলে অকাল তথ্‌ত্‌ জখম করার দায় তাঁকেও বহন করতে হতো। যদিও দায়িত্বটা তাঁর নয়। দিল্লীতে যাঁদের বাস স্থানীয় রিয়ালিটি থেকে তাঁরা অনেক দূরে। রাজ্যপালই তাঁদের চোখ কান। আবার চণ্ডিগড়ে যিনি থাকেন রিয়ালিটি থেকে তিনিও কতকটা দূরে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটই তাঁর চোখ কান। এঁদের ইচ্ছা অনিচ্ছা বা মতামতের জন্যে তোয়াক্কা না রেখে মিলিটারি যা খুশি করে যেতে পারে। সব কিছুই কি ঠিক? ঠিক বেঠিক বিচার করবে কে? মিলিটারি না সিভিল অথরিটি? সুতরাং যথাসম্ভব অবিলম্বে মিলিটারিকে ভারমুক্ত করাই সঙ্গত।

মাস ছয়েক আগে একটি ইনটারভিউতে আমি বলেছিলাম সামরিক সমাধান নেই, রাজনৈতিক সমাধানের কথাই ভাবতে হবে। সেটা অবশ্য আমার কাজ নয়, রাজনীতিকদের কাজ। শেষপর্যন্ত তাঁরা মিলিটারির উপরেই বরাত দিলেন। এখন বাঘের পিঠ থেকে নামা আরো কঠিন। নামলে কুমীরের মুখে পড়তে হবে। সন্ত্রাসবাদীরা গভীর জলে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। নানা সূত্র থেকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করবে। সব ক'টা যে বিদেশী সূত্র তাও নয়। তা হলে কি অনন্তকাল মিলিটারির অবস্থান? সিভিলের বকলমে মিলিটারি রুল? জানিনে, তবে এইটুকু জানি যে রাজনৈতিক সমাধানের যতই বিলম্ব হবে আমাদের সামনে বিকল্প সংখ্যা ততই কমে আসবে। মুসলিম লীগের বেলা যেমন হয়েছিল। শেষের দিকে দুটিমাত্র বিকল্পে ঠেকেছিল। হয় পার্টিশন নয় সিভিল ওয়ার। জিন্নাসাহেব তৈরি ছিলেন কয়েক লাখ মুসলমান কোরবানী দিতে। অবশ্য কয়েক লাখ হিন্দু শিখ কোতল করে। ভিন্দ্রানওয়ালে ও তাঁর দলবলও না মেরে মরেননি। শ'তিনেক উগ্রপন্থী যেমন নিহত হয়েছে শ' খানেক সৈনিকও তেমনি। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন অফিসার। উগ্রপন্থী নেতা যদি স্থির করেন যে তিনি দশ হাজার প্রাণ খরচ করবেন তবে সরকারকেও স্থির করতে হবে তাঁরাও আড়াই হাজার প্রাণ খরচ করবেন। পরে এই হার আরো বাড়তে পারে। তখন হয় খলিস্থান স্বীকার নয় অন্তহীন গৃহযুদ্ধ। শিখরা যে কতদূর যাবে তা কে বলতে পারে? ইংরেজরাও তাদের সহজে বশ করতে পারেনি।

ইতিমধ্যে ঘটে গেছে আরেক দফা হাই জ্যাকিং। ভাগ্য ভালো, দুবাই সরকার ভারতের মুখ রক্ষা করেছেন। যাত্রীদের বাঁচিয়েছেন, প্লেন ফেরৎ ও হাই জ্যাকারদের সমর্পণ করেছেন। কিন্তু হাই জ্যাকিং কি আর কখনো হবে না? কৃপাণ কি নিষিদ্ধ হয়েছে? হলে শিখরা কি প্রতিবাদ করবে না? প্লেনে ওঠা বন্ধ করে দেবে না? শত্রু মিত্র সবাইকে সন্দেহ করা বিজ্ঞতা নয়। আবার সবাইকে বিশ্বাস করাও বিপজ্জনক। শিখ দেখলে হিন্দু যাত্রীরাও ডরাবে। প্লেনে ওঠা বন্ধ করবে। তা হলে কি হিন্দু প্লেন ও শিখ প্লেন দু'প্রস্থ প্লেন হবে? কেবল হিন্দুদের জন্যে ও কেবল শিখদের জন্যে? কেবল যাত্রীরা নয়, পাইলটরাও ভয় পাবে। তা হলে কি শিখ পাইলট ও হিন্দু পাইলট? এ এক দারুণ প্রশাসনিক সমস্যা।

ভিন্দ্রানওয়ালের নিধনের সংবাদ পেয়ে হিন্দুরা নাকি মিষ্টান্ন বিতরণ করেছে। ওদিকে শিখদের ঘরে ঘরে হাহাকার। এই যেখানকার অবস্থা সেখানে হৃদয়ের

to the two major communities in paragraphs 15 and 19 of the Cabinet Mission proposals."

ক্যাবিনেট মিশন দুই প্রধান সম্প্রদায়কে সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন, শিখদের সমান মর্যাদা দেননি। এতেই তাঁরা ক্ষুব্ধ হন। এ ক্ষোভ দূর করার জন্যে মিশনও কিছু করেন না, মুসলিম লীগও না, কংগ্রেসই যা করার করে। তাও অনির্দিষ্টভাবে। যাই হোক শিখরা কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে আসেন, কিন্তু লীগপন্থীরা আসেন না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সর্বসম্মত সংবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন না, ভারত ভাগ করে ক্ষমতার হস্তান্তর করে চলে যান। মাউন্টব্যাটেনের প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লীগ নেতারা যখন সায় দেন তখন শিখ প্রতিনিধি সর্দার বলদেও সিং শিখদের হয়ে সায় দেন। এরপর কনস্টিটুয়েন্ট এ্যাসেম্বলি বলতে যা বোঝায় তা খণ্ডিত ভারতের। তাতে খণ্ডিত পাঞ্জাবের শিখ প্রতিনিধিরাও থাকেন। সকলের জন্যেই স্বতন্ত্র নির্বাচন তথা ওয়েটেজ উঠিয়ে দেওয়া হয়, সুতরাং তাঁরা বলতে পারেন না যে তাঁদের প্রতি অবিচার হয়েছে। ব্যতিক্রম যেটা হয় সেটা তফসিলী হিন্দু, শিখ ও ট্রাইবদের বেলা, সাময়িক-ভাবে। ধর্ম অনুসারে আসন ভাগ বা মন্ত্রিত্ব ভাগ বা চাকরি ভাগ কারো খাতিরেই হয় না। ভূতপূর্ব ব্রিটিশ রাজ ভূতপূর্ব শাসনতন্ত্রগুলিতে মুসলিম ও শিখ সম্প্রদায়দ্বয়কে যেসব সুবিধা দিয়েছিলেন সেসব স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতাদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। তবে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়কে অভয় দেওয়া হয় যে ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তই তাঁদের সম্মতি না নিয়ে গৃহীত হবে না। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে ধর্মীয় ব্যাপার রাজনৈতিক ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক ব্যাপার ধর্মীয় ব্যাপার নয়।

মুসলমানরা ও শিখরা ধর্মের থেকে রাজনীতিকে ও রাজনীতির থেকে ধর্মকে পৃথক করতে অভ্যস্ত নন। পাকিস্তানে তথা বাংলাদেশে এখনো এর মীমাংসা হয়নি। খালিস্তান হলেও যে মীমাংসা হবে তা নয়। মোল্লা আর মিলিটারি মিলে গণতন্ত্রকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। খালিস্থান হলেও তেমনি সন্ত আর মিলিটারি মিলে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে পাঠাবে। খণ্ডিত না হলে ভারতকে এঁরা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রণয়ন করতেই দিতেন না। এখন খণ্ডিত ভারতে সাঁইত্রিশ বছর বাস করার পরও সেই একই অগণতান্ত্রিক মনোভাব। শিখদের খাতিরে সংবিধান সংশোধন করলে খ্রীষ্টানদের খাতিরেও করতে হবে। মুসলমানদের জন্যেই বা কেন নয়? তাঁদের সংখ্যা তো আরো বেশী বিশেষতঃ কাশ্মীরে। অপর পক্ষে এটাও সত্য যে মুসলমানরা

পাকিস্তান পেয়েছে, শিখরা স্বাধীন রাষ্ট্র পায়নি। এই সত্য শিখ ধর্মগুরু ও ধর্মযোদ্ধাদের নতুন প্রেরণা ও প্ররোচনা জোগাচ্ছে। ভারত যদি আবার খণ্ডিত হয় আমি বিস্মিত হব না, তবে আমার বিশ্বাস রেফারেণ্ডাম হলে অধিকাংশ শিখ ভারতের পক্ষেই ভোট দেবে। খালিস্তানের পক্ষে নয়। তাই যদি হয় তবে বাকী থাকে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি কি ভাবে করতে হবে। প্রশ্নটা হচ্ছে দেশ ভাগ নিয়ে নয়, ক্ষমতা ভাগ নিয়ে। এ প্রশ্নটা বিবেচনা করার জন্যে কমিশন গঠিত হয়েছে। একজন শিখই তার সভাপতি। কমিশনের সুপারিশের জন্যে আমরা অপেক্ষা করব।

পঞ্চভূতের আসর

'নারীমুক্তি'

ক্ষিতি খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে বলিয়া উঠিল, নাঃ, এ আর সহ্য হয় না।

সমীর বলিল : ভ্রাতঃ, কি সহ্য হয় না? নেতাদের ছেঁদো বক্তৃতা?

ক্ষিতি কাগজ রাখিয়া দিয়া বলিল, না হে, এই নারীমুক্তির ধুয়া। রেডিওতে অষ্টপ্রহর ঐ বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া কান ঝালাপালা হইবার জোগাড়, আবার খবরের কাগজেও ঐ একই জিনিষ দেখিলে মেজাজ রক্ষা করা দুষ্কর হয়। আমি তো আজও এই নারীমুক্তির প্রকৃতিটাই বুঝিয়া উঠিলাম না। ইহারা কোন্ বন্ধন দশা হইতে মুক্তি খুঁজিতেছে? ইহারা কি বিধাতা নির্দিষ্ট নারীত্ব হইতেই মুক্তি কামনা করে?

সমীর বলিল, আমরা পুরুষ জাতি এতকাল ধরিয়া নারীকে সংসারবন্ধনের রজ্জুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া নারীসংসর্গ বর্জনকেই ভবরোগমুক্তির বিশল্যকরণী বলিয়া ঘোষণা করিয়া আসিয়াছি; এবং নারীসংস্রবত্যাগকেই সন্ন্যাস আখ্যা দিয়া অরণ্যে পর্বতে গিয়া ঈশ্বরের ভজন অন্বেষণ করিয়াছি: এখন নারীরাও হয়তো অনুরূপ যুক্তিতে পুরুষের সংস্রব হইতে মুক্তিকেই তাহাদের পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেছে।

দীপ্তি তপ্ত স্বরে ঝঙ্কার দিয়া কহিল, কেন, পুরুষশাসিত সমাজে নারীজাতি

যে আজও সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে, তাহা কি তোমরা দেখিতে পাওনা? তাহার উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে নানা নিষেধ বিধির নিগড়: পান হইতে চুনটি খসিলে তাহার জাত কুল মান যায়, শৈশব হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সর্বাবস্থায় সে পুরুষের অধীন; তাহার স্বাধীন সত্তা সংবিধানে স্বীকৃত হইলেও সমাজে আজও অস্বীকৃত,—ইহা তো দিবালোকের ন্যায় প্রত্যক্ষ। এই মনুষ্যত্বের অতি অপমানকর বন্দিত্ব হইতে মুক্তির ইচ্ছা কি একান্ত অসঙ্গত? এই অন্যায়ের অবসানকল্পে দেশের প্রান্তে প্রান্তে আজ আন্দোলন জাগিয়াছে। ইহাই নারীমুক্তি আন্দোলন।

সমীর বলিল, আমি তো দেখি পুরুষই নারীজাতির বশ, নারী যে পুরুষের অধীন ইহা কেবল মনুসংহিতাতেই আছে। কার্যতঃ আমরা তো দেখি মেয়েরা তাদের স্বামীসহ সংসারতরীটিকে অত্যন্ত দক্ষ মাঝির মতো স্বচ্ছন্দে বাহিয়া চলিতেছে। সংসারের হাজার পাল-পার্বন, সামাজিকতা, লৌকিকতা কুটুম্বিতা, ও তাহার সকল দায়দায়িত্ব তাহারাই অনায়াস নৈপুণ্যে ও হাসিমুখে নির্বাহ করিতেছে: পুরুষেরা তাহাদের হুকুম তামিল করিবার জন্যই সর্বদা উন্মুখ বলিয়াই মনে হয়। পরিবারে ও সমাজে, ঘরে ও বাইরে, যে হাজার মানবিক সম্বন্ধের জালে আমাদের অস্তিত্ব অনুস্যূত, মেয়েরা আছে বলিয়াই তো সেই সকল গ্রন্থির বিচিত্র দাবির প্রতি সহৃদয় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়, কোনো সম্বন্ধই ছিন্ন হয় না, কোনো সুষমাই ভগ্ন হয় না, সমস্ত সংসার সুন্দর ঐকতানের মতো তানে লয়ে সুসঙ্গত হয়,—নহিলে পদে পদে বেদনা বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিষম হুলুস্থুল কাণ্ড হইত। মেয়েরাই সংসারের কাণ্ডারী বলিয়া সংসাররূপ বাণিজ্য আজও চলিতেছে, নচেৎ কবে সেখানে দেউলিয়া লাল্‌বাতির নিশানগাড়ি পড়িত!

দীপ্তি রাগত স্বরে কহিল, ঐরূপ ছলনা দিয়াই তোমরা মেয়েদের এতকাল ভুলাইয়া রাখিয়াছ। মেয়েরা কখনোই সংসারের কাণ্ডারী নহে: পুরুষেই তালুক-মুলুক টাকাকড়ির মতো মেয়েদেরকেও তাহাদের খাসদখলি সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করে। শাস্ত্র ও সমাজ সেই দাবির সমর্থনে বচন ও শাসন উঁচাইয়া সর্বদা হাজির। দাস-দাসীর পক্ষে যেরূপ কাজ না করিলে নিস্তার নাই, খোরাকপোশাক বন্ধ—মেয়েদের পক্ষেও সেইরূপ। সংসারে হাঁড়িঠেলা হইতে ঠাকুরসেবা পর্যন্ত তাহাকে নির্বাহ করিতে হয়, কারণ, না করিয়া উপায় নাই, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম। উৎসবে ও লোকলৌকিকতাতেও আমাদেরই যে সর্বাগ্রে দেখিতে পাও তাহারও কারণ, আমরাই মিষ্ট করিয়া হাসিতে পারি, অভ্যর্থনা

করিতে পারি, মিষ্ট স্বর বিস্তারে উৎসবকে মাধুর্যমণ্ডিত করিতে পারি—এই বিধাতাদত্ত ক্ষমতাগুলির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার পুরুষের নির্দেশেই আমাদের করিতে হয়,—না করিলে সমূহ অশান্তির আশঙ্কা।

স্রোতস্বিনী মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলিল, মেয়েরা যে সংসারে পুরুষের জোহুকুমতন্ত্রে বন্দিনী ক্রীতদাসী মাত্র ইহাও ঠিক সত্য নহে। ভালবাসা মেয়েদের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া তাহারা হৃদয়ের তাগিদেই সংসারের সকল কাজ আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন করে। স্বামীকে, সন্তানকে সে ভালবাসে বলিয়াই সে তাহাদের সেবায় কখনো ক্লান্তিবোধ করেনা, এবং তাহাতে কোনরূপ সম্মানের প্রশ্নও জড়িত আছে মনে করেনা। সে যদি সংসারে নিজেকে পর বলিয়া মনে করিত তাহা হইলে সংসারের চাকা আর্তনাদ করিয়া কবে থামিয়া যাইত, দেনাপাওনার কারবার কবেই উঠিয়া যাইত, স্নেহপ্রেম আত্মদানের মাধুর্যে যাহাকে নন্দনকানন বলিয়া ভ্রম হয় সেই নিত্যদিনের সংসারকে ভয়শাসিত অন্ধ কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইত। মেয়েরা ভালবাসে বলিয়াই সংসারে সকলের নীচে থাকিয়াও কোনো হীনতার লজ্জা ও অপমানবোধ কখনো অনুভব করে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে মেয়েদের প্রতি অনেক অন্যায় ও অবিচার জমা হইয়া উঠে নাই, ইহাও সত্য নহে।

আমি কহিলাম, শ্রীমতী স্রোতস্বিনী খুব মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। সংসার পুরুষ মানুষের একার রচনা নহে। স্ত্রী-পুরুষ একত্রেই ইহা রচনা করিতেছে। ইহার পশ্চাতে যে শক্তি কাজ করিতেছে তাহাকে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাণবেগ বলিতে পারো। বসন্তের শুরুতেই যে দুর্বার তাগিদে কাক দম্পতিরা গাছে গাছে বাসা রচনা করে, সেখানে পুরুষ ও স্ত্রী কাকের ব্যাকুল ব্যস্ততায় কোনো প্রভেদ লক্ষিত হয় না। মানুষের সংসার রচনাও একই প্রবর্তনার ফলে। তবে মানুষ তাহার রচিত নীড়কে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী রূপ দিতে চেষ্টা করে যেহেতু পক্ষীশাবক অপেক্ষা মানবশিশু আত্মনির্ভরতা লাভে অনেক বেশী সময় নেয়। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজনের স্নেহনীড়ের আশ্রয় তাহার সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রয়োজন। মেয়েদের ভালবাসিবার ক্ষমতা বেশী কারণ প্রকৃতি তাহাদের বুকে স্নেহের অমৃত উৎসটি স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রাণের ধাত্রী। কেবল শুন্যরসেই তাহারা নূতন জীবনকে লালন করে না; অনলস সেবা, শুশ্রূষা ও পরিচর্যা ও নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগ সিঞ্চনে গৃহপরিমণ্ডলকে তাহারা নবীন বিকাশায়মান জীবনের পক্ষে এক সর্বতোভদ্র, সর্বাধিক অনুকূল ক্ষেত্ররূপে রচনা করে। পুরুষ যে ভালবাসে না বা ভালবাসিতে জানে না তাহা নয়, কিন্তু তাহার

প্রকাশ ভিন্নতর। প্রকৃতির নির্দেশে তাহার কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র,—গৃহনীড়ের ভরণ পোষণ ও সংরক্ষণের ভার তাহার উপর। তাহাতেই তাহাকে তাহার সকল শক্তি লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কিন্তু তাহারও অন্তঃপ্রেরণা সেই প্রাণের তাগিদ, ভালবাসার প্রবর্তনা। কেবল লালন পোষণ নয়, নবীন প্রজন্মকে সমাজের অর্জিত বিদ্যায় পারঙ্গম করার দায়িত্ব ও তাহার। তাই তার মেধের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ও সংযত, তাহা অন্তঃস্রোতশীল। নারীর ভালবাসা নীড়কে লালনসুভগ করার কাজে সদাব্যাপৃত বলিয়া তাহার কার্যক্ষেত্র স্বভাবতঃই গৃহমণ্ডলের মধ্যে। এইভাবে স্ত্রীপুরুষের কর্মের প্রতিবেশ ও এলাকা স্বতঃই কিঞ্চিৎ ভিন্ন হইয়াছে। নারীকে অন্তঃপুরে বন্দিনী কল্পনা করায় সত্যতা নাই। পুরুষও যদি নিজেকে গৃহসুখনির্বাসিত, নিশিদিন কর্মব্যাপৃত ভৃত্যরূপে কল্পনা করে তাহাও অযথার্থ। উভয়ের মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতায় গৃহনীড় বা সংসারের স্থিতি ও চিরত্ব। যদি বন্দী বলো, উভয়েই সংসারের চাকায় বাঁধা, উদয়াস্ত উহা ঠেলিতে হইতেছে। কিন্তু এ তো দাসত্বের বন্ধন নয়, স্বভাবের প্রবর্তনায় ও প্রাণের আগ্রহেই আমরা এই সংসার যজ্ঞ উদ্‌যাপনে ব্রতী, ইহার দুঃখবেদনাও তাই আনন্দের রসায়ন।

ক্ষিতি কহিল, কিন্তু মেয়েরা এখন আর সংসারের চাকা ঠেলিতে রাজী নয়। তাহারা বলিতেছে আমরাই কেন রান্নাবাড়া ও ছেলেপিলে মানুষ করিতে অহর্নিশি ব্যাপৃত থাকিব? পুরুষেও এই দায়গুলি আমাদের সঙ্গে ভাগ করিয়া লউক। তাহারা কেবল সেবা গ্রহণ করিবে আর আমাদের সেই সেবা জোগাইয়া চলিতে হইবে, ইহা জুলুম ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরাও অফিশ কাছারী, আইন আদালত, ব্যবসা বাণিজ্যের হাপা যে না সামলাইতে পারি তা নয়; পুরুষ মানুষের মতো টাকা রোজগারও যে আমাদের অসাধ্য নয় তাহাও নিত্য প্রমাণিত হইতেছে,—তবে কেন আমাদেরকেই সন্তান প্রতিপালনের সমস্ত ঝক্কি ও হেঁসেল সামলানোর সব দায় বহন করিতে হইবে? পুরুষে কেন ভাগ করিয়া এই সব ঝকমারির অর্ধেক সহ্য করিবে না? সংসার তো একা মেয়েদের দায় নয়?

সমীর কহিল, একেবারে সমান সমান দায়ভাগ বাঁটোয়ারা হয় তো সম্ভবই নহে। সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও পরে স্তন্যরসে ও ঐকান্তিক সেবায় পরিপোষণ—এ দায় তো প্রকৃতিই মেয়েদের উপর তুলিয়া দিয়াছে। এ দায় তো শত চেষ্টা করিলেও পুরুষে ভাগ করিয়া লইতে পারে না। প্রকৃতি বা নিয়তির বিধানেই নারীর জন্য অন্তঃপুর ও পুরুষের জন্য বহির্বাটিকা নির্দিষ্ট হইয়া

গিয়াছে। ইহাকে স্বভাবনির্দিষ্ট শ্রমবিভাগও বলিতে পার। তবে প্রয়োজন হইলেও নারী যে অন্তঃপুরের বাহিরে আসিতে পারিবে না এবং পুরুষের কাজের জোয়াল নিজের স্কন্ধে লইয়া সংসারের আর্থিক দায়িত্ব নির্বাহ করিতে পারিবে না,—এরূপ নিষেধবিধিও অন্যায়। তবে প্রাকৃতিক শ্রমবিভাগের বিপর্যয় সাধনেও যে কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা মনে লয় না।

দীপ্তি কহিল, যাহা প্রথমে প্রাকৃতিক শ্রমবিভাগ ছিল, তাহা পুরুষের চরম স্বার্থপরতায় নারীনির্যাতনের অস্ত্রস্বরূপ হইয়াছে। পুরুষ অন্তঃপুরের প্রাচীরকে ক্রমেই উচ্চ করিয়া তুলিয়া, অন্তঃপুরকে কারাগারে পরিণত করিয়াছে এবং নারীকে সেখানে বন্দী করিয়াছে। আর সংসারের অর্থনৈতিক লাগাম নিজের হাতে রাখিয়া নিজেকে স্বেচ্ছাচারী স্বৈরশাসকে পরিণত করিয়াছে। যে কর্ম-বিভাগ মূলে কোনও অসাম্যের ইঙ্গিত বহন করিত না, জীবনযাত্রার প্রয়োজন-সাধকমাত্র ছিল, ক্ষমতালোভী পুরুষের হাতে, নারীর অর্থনৈতিক অধীনতার সুযোগে, চিরস্থায়ী হীনতালাঞ্ছিত অধিকার-বৈষম্যের প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল। নারীকে অন্তঃপুর সীমায় বন্দী করিয়া রাখিয়া তাহার সমস্ত অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অপহরণ করা হইল। নারীকে সর্ব মানবিক অধিকার-বঞ্চিত, পুরুষের সন্তানধাত্রী ও সেবিকারূপে মাত্র পর্যবসিত করায় এই অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে সকল যুগের নারীই প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। পুরুষের মধ্যেও যাঁরা মহৎ তাঁহারাও ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তবুও মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসের পরিণতিতে কেবল এই আধুনিক যুগেই, এবং এই বিংশ শতাব্দীতেই, নারীর সমান অধিকারের দাবী সমস্ত উন্নত দেশে স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশেও স্বাধীনতা-উত্তরকালে আইনে এবং সংবিধানে এই সমানাধিকারতত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সমাজে এখনো সেই সাম্যনীতি সর্বত্র স্বীকৃত নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা লঙ্ঘিত ও অপমানিত। আমাদের নারীমুক্তি আন্দোলন এই সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে।

ব্যোম কহিল, ইতিহাসের অনেক পর্বে নারী-অধিকারের বৈজয়ন্তী সগৌরবে সমুড্ডীন হইয়াছে, আবার পর্বান্তরে তাহার অপহ্নবও ঘটিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরের প্রথম সাম্রাজ্যকালে, রাণী হাৎশেপ্‌সুৎ-এর রাজত্বে, আজ হইতে পাঁচ হাজার বছর আগেও যে-সমুন্নত নারী অধিকারের বিধিবিধান প্রচলিত ছিল, তাহা ইওরোপেও উনিশ শতকের শেষ লগ্নেও কোথাও ছিল না। তেমনি প্রাচীন ব্যাবিলনে হামুরাবির রাজকীয় লেখমালায় যে উন্নত

নারী অধিকারের আইনস্বীকৃত অনুশাসনসমূহ উৎকীর্ণ দেখিতে পাই সেরূপ উন্নত সভ্যতার নিদর্শন বিগত শতাব্দীর ইয়োরোপ আমেরিকার বিধিবিধানেও পাই না। গ্রীক ও রোমক সভ্যতায়ও যে পরিমাণ নারীসাম্য স্বীকৃত ছিল ইয়োরোপের মধ্যযুগ হইতে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত তাহার ছায়ামাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতের ইতিহাসেও প্রাচীন হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত নারীর অধিকার ও মর্যাদার ক্রমিক অবলুপ্তির ইতিহাস। আবার ইংরেজ শাসনে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আদর্শের সংস্পর্শে আসিয়া আমরা নারীর অধিকার পুনরুদ্ধারের বিষয়ে সচেতন হইয়াছি। আমাদের বর্তমান সাংবিধানিক অনুশাসন উহারই ফলশ্রুতি। সর্বত্রই সভ্যতার অবনতির সমান্তরালে নারী অধিকারের সঙ্কোচন পরিলক্ষিত হয়। নারী যেখানে পূজিতা দেবতারা সেখানে সুখী—মনুর এই উক্তিটিকে অন্যরূপেও বলা যায়: নারীর সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার পরিমাপেই সভ্যতার উন্নতির মান সূচিত হয়। তবে, বর্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশে যে-'উইমেন্‌স্ লিব'-এর ধ্বজা উড্ডীন হইয়াছে ইহাকেও সুস্থ মানসিকতা বলা চলে না।

আমি বলিলাম, সভ্যতার মানের সঙ্গে নারীর সমান-অধিকার স্বীকৃতির কোনো নিকট সম্বন্ধ সত্যই আছে কিনা বলা শক্ত। বহু আদিম জাতীয়দের মধ্যে মাতৃতন্ত্র ও মাতৃকুলপরিচয়ে ব্যক্তি-পরিচিতি এখনো প্রচলিত, অর্থাৎ সেখানে নারীর অধিকার সর্বোচ্চে। কিন্তু তাঁহাদের সভ্যতার মান এখনো আদিম পর্যায় অতিক্রম করে নাই। মধ্য ভারতের বনবাসীদের মধ্যে যদিও মাতৃকৌলিকতা বা মাতৃতন্ত্র বলবৎ নহে তবু তাহাদের মধ্যে নারীর বৈবাহিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অপেক্ষাকৃত সভ্যতর সমাজ অপেক্ষা অনেক বেশী উদার। দরিদ্র শ্রমজীবীদের মধ্যেও, যেখানে স্ত্রী পুরুষে মিলিতভাবে উপার্জন করিতে বাহির হয়, স্ত্রীলোকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার যথেষ্ট সুপ্রসর ও সুব্যবস্থিত। তাহারা যেমন নিজেরা রোজগার ও কেনাকাটা করিতে পারে, তেমনি বিবাহ ব্যাপারে ও বিবাহবিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে, তাহাদের স্বাধীনতা অপর্যাপ্ত। সব দেশেই উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণদের ক্ষেত্রেই নারীর অধিকার সঙ্কোচন বেশী ঘটিয়াছে। সম্পত্তির অখণ্ডতা রক্ষা ও বংশের রক্ত ধারার পবিত্রতা রক্ষার অতি আগ্রহই ইহার মূলে কাজ করিয়াছে। তাহার উপর রাষ্ট্রনৈতিক উপপ্লবের কালে সমাজ ব্যক্তিমাত্রেরই স্বাধীনতা সঙ্কোচ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া থাকে—নারীর অধিকারও সেকারণে আরও খণ্ডিত হয়। মধ্যযুগের ভারতে সেই কারণেই দেখি যেমন পুরুষ

মানুষের বেলায় আহারে বিহারে ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঁধনের পর বাঁধন পড়িয়াছে, তেমনি মেয়েদেরও পায়ে শিকলের পর শিকল চড়িয়াছে,—দুঃসময়ে আত্মরক্ষার জন্য চারিদিকে নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া সমাজ ক্রান্তিকাল পার হইতে প্রয়াস পাইয়াছে। নিরুপদ্রব শান্তি সুনিশ্চিত হইলেই সভ্যতারও অগ্রগতি ঘটে এবং নরনারী নির্বিশেষে সকলেরই অধিকারের আপেক্ষিক বিস্তার লাভ ঘটিতে দেখা যায়। যেখানে পথে বাহির হইলেই রাহাজানির আশঙ্কা সেখানে আইনে যতোই কেন না অধিকারের কথা বিধিবদ্ধ থাক্ পথে না চলিতেই লোকে আগ্রহী হইবে। এবং পথে নারী-যে বিবর্জিত হইবেই সে কথা বলাই বাহুল্য। কাজেই নারীর অধিকারের মাত্রার নিরিখে সভ্যতার উন্নতি অবনতির অঙ্কপাত সর্বদা সার্থক নয়।

ক্ষিতি বলিল, দেখ, নরনারীর সম্পর্ক এমন অন্যোন্যাশ্রয়ী, এমন পরস্পরের সঙ্গে লতাইয়া জড়াইয়া রহিয়াছে যে, একটিকে টান দিলেই আরেকটিতে টান পড়ে। নরনারীর প্রতিস্পর্ধী অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যকামিতা সৃষ্টির অভিপ্রেত নয়। নর ও নারী সম্মিলিত প্রয়াসে ও প্রযত্নে সংসারধর্ম উদ্‌যাপিত করিবে ইহাই বিধাতার নির্দেশ। যেমন আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে সবগুলি অঙ্গের সমবায়ী সহযোগে প্রাণকর্ম নির্বাহ হয়, সেখানে ছোট বড় লঘু গুরুর প্রশ্ন নাই, কোনো অঙ্গের অধিকার-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নও নাই—সৃষ্টিধারা ও বংশগতি রক্ষার কাজেও স্ত্রী পুরুষের স্বাতন্ত্র্যনিরপেক্ষ সমবায়ী সহযোগিতাও কি তেমনি প্রকৃতিনির্দিষ্ট নহে? যদি হাত ও পায়ের মধ্যে, মস্তক ও উদরের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যেচ্ছা ও উচ্চতর অধিকারের প্রতিদ্বন্দ্বী দাবি উত্থিত হইত, তাহা হইলে জীবনরক্ষাই দুষ্কর হইত, প্রাণের ঐকতান বিনষ্ট হইত, আত্মদ্বন্দ্বে আত্মবিনাশ সুনিশ্চিত হইত। কিন্তু যদিও ব্যক্তিজীবের ক্ষেত্রে প্রাণধর্মের ঐক্য ও স্বর-সঙ্গতি এরূপ নিরর্থক দ্বন্দ্ববিক্ষোভে বিঘ্নিত হয় না, তথাপি প্রাণের বৃহত্তর প্রকাশের ক্ষেত্রে, প্রাণপ্রবাহ ও বংশধারার অবিচ্ছিন্নতা সম্পাদনের ক্ষেত্রে, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের অঙ্গাঙ্গী সহযোগিতা কেন যে এই সব তুচ্ছ শ্রেষ্ঠত্বাভিমানের প্রশ্নে তর্কসঙ্কুল হইয়া উঠে তাহা আমি বুঝিতে পারি না। স্ত্রী ও পুরুষ তো পরস্পর বিচ্ছিন্ন নহে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতোই তাহারা পরস্পর সমবায়ী, তবে কেন স্ত্রীগণ এখন সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য লইয়া আস্ফালনের কুয়াশা সৃষ্টি করিয়া শাশ্বত মৌল সত্যকেই ঢাকিয়া ফেলিতে চায়? ইহাই আমাকে পীড়িত করে।

স্রোতস্বিনী বলিল, তুমি যা বলিলে তাহা সর্ববাদিসম্মত; স্ত্রী-পুরুষ যে

প্রাণযজ্ঞের হোতা ও অধ্বর্যু, এবং তাহাদের সংযোগী ক্রিয়া ব্যতিরেকে যে এ যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে না, এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত দেখি না। কিন্তু যেহেতু স্ত্রী ও পুরুষ স্বতন্ত্র মন-বুদ্ধি-আত্মা-সম্বলিত অবচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বও বটে, তাই তাহাদের উভয়েরই মানবিক অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নও তাহাদের ব্যক্তিত্বের সহিত জড়িত। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বতন্ত্র মন বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের বালাই নাই, তাহারা প্রাণের নির্দেশে অচেতনভাবেই একত্র সংযোগী। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের ক্ষেত্রে সে উপমা খাটে না: তাহাদের সমবায়ী সহযোগিতা ততদূর অচেতন ও স্বতস্ফালিত নহে। আমরা উভয়েই মূলতঃ মানুষ এবং তদুপরি স্ত্রী বা পুরুষ। তাই মানুষমাত্রেরই যে সকল সাধারণ বৈশিষ্ট্য, গুণ ও ক্ষমতার স্বারাজ্য আছে, ও যাহার পরিপূর্ণ বিকাশেই তাহার মনুষ্যত্ব ও সার্থকতা, সেই সব বৈশিষ্ট্য, গুণ ও ক্ষমতারাজির বিকাশের অধিকার হইতে স্ত্রীজাতীয়েরাই বা কেন বিশেষ ভাবে বঞ্চিত হইবে? কেন তাহাকে তাহার ঈশ্বরদত্ত সম্পদ, তাহার মেধা বুদ্ধি জ্ঞান ও চারিত্রের পূর্ণতম বিকাশে ও অনুশীলনে বঞ্চিত করা হইবে? কেবলমাত্র পুরুষের ক্ষেত্রেই পরিপূর্ণ মানুষ হইয়া ওঠার সব সুযোগ কেন দেওয়া হইবে, আর স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেই তাহাকে দুধের বদলে পিটুলিগোলা দিয়া মানবোচিত শক্তি সামর্থ্য অর্জনের সুযোগ কেন দেওয়া হইবে না? ইহাকে যদি পুরুষশাসিত সমাজের পক্ষপাতদুষ্ট বৈষম্য বলি সে কি অন্যায়? স্ত্রীলোকের প্রতি এই অবিচার দ্বারা সমাজ কিন্তু নিজেকেই পঙ্গু করিয়াছে,—নারীও যদি পুরুষের মতো পূর্ণ মনুষ্যত্বে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিত তবে সমাজ-জীবনই সমুন্নত জীবনচর্যার সার্থক দৃষ্টান্ত হইতে পারিত। নারীর মনুষ্যত্বকে অপরিণত ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়া সমাজ নিজেকে একপক্ষ বিহঙ্গের মতো অচরিতার্থ করিতেছে না কি? আমরা বলি, মেয়েদেরও মানুষ হইয়া উঠিবার সমস্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করো, শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞানকর্মানুশীলনে তাহাকে আত্মবিকাশের সকল সুযোগ দাও, কেবল পুরুষ জাতিকে নয় নারীকেও পূর্ণ মানুষ করিয়া তোলো, দেখিবে তাহাতে সমস্ত সমাজেরই কল্যাণ হইবে। মেয়েমানুষকে আধখানা মানুষ করিয়া রাখিবার পুরুষালি ব্যবস্থাকে পুরুষের স্বার্থেও সমর্থন করা যায় না। পঙ্গু সমাজে পুরুষও পঙ্গু হইয়া থাকে। নিত্যসহচরী নারীর নিকট মনুষ্যত্বের আদর্শ ও প্রেরণা লাভ করে না বলিয়া, সর্বক্ষেত্রে অতিরিক্ত সুযোগ লাভ করিয়াও সে মনুষ্যত্বকে আয়ত্ত করিতে পারে না। মাতৃঅঙ্কেও মাতৃস্তন্য ও মাতৃস্নেহের সমধারায় মনুষ্যত্বের আদর্শ আত্মকৃত করার সুযোগ সে পায় না। ইহাতে সমস্ত সমাজেরই ক্ষতি ঘটিয়া থাকে।

(২১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মৃত্যুহীন / রেণুকণা পাকড়াশী

ষোলটি মৃত্যুবাণ হানতে হ'ল
একটি বিশ্বাস ভালাসাপূর্ণ
হৃদয়কে বিদ্ধ করতে ?
কি চেয়েছিল রক্ষকরূপী ঘাতক ?
ইন্দিরার মৃত্যু ?
ওরা ত জানতো না, হায়,
বিস্মরণের বৈতরণী পার না হলে
মৃত্যু হয় না।
ঘাতকের বাণ নিহত করলো একটি দেহ।
সেই প্রবল প্রাণ নিমেষে ছড়িয়ে পড়লো
অণুতে অণুতে
বিশ্বচেতনার তারে
আঘাত করে ঝন্ ঝন্ বেজে উঠলো।
স্বদেশে বিদেশে,
প্রাসাদে কুটিরে,
লোক হতে লোকান্তরে।
আপনি ধ্বনিত হ'ল, ইন্দিরা অমর।
হে মৃত্যুহীনা,
ভুলবো না, ভুলবো না, ভুলবো না তোমায়।
শুধু ত ভারত নয়,
সমস্ত বিশ্বের
বেদনায়, দারিদ্র্যে, অপমানে, অবিচারে
তুমি ছিলে মূর্ত প্রতিবাদ।
ঘাতকের বাণ স্তব্ধ করলো সেই বাক্।
নিহত করলো দেহ।
কিন্তু প্রাণ ? সে প্রতিষ্ঠিত হ'ল
অক্ষয় স্মরণে।
বিস্মরণের বৈতরণী পার না হলে
মৃত্যু হয় না।
মৃত্যু হ'ল না।

স্থানাভাব / কল্যাণ সেনগুপ্ত

যে-কোনো নক্ষত্রে নাকি তাবৎ সমুদ্রতীরে যত বালুকণা
ততগুলি পৃথিবী এঁটেও
পড়ে থাকবে অনন্ত বিস্তৃতি।
এবং নক্ষত্র সংখ্যা নিশ্চিত ক'কোটি
ব্রহ্মা কি নিজেও জানেন ?
ভাবুন ব্যাপারখানা !
মহাবিশ্বে এই কাণ্ড, আর পৃথিবীতে
স্থানাভাব এত বেশি যে, যে যেখানে আছি
পিঁজরাপোলে গাদাগাদি করে
গরু-ছাগলের মতো এ-অন্যের নিঃশ্বাস চিবিয়ে
কোনো মতে আছি।

অথচ একজন
বিশাল ক'কোটি তারা, যোজন-যোজন জমিদারি
নিয়ে পা এলিয়ে খুব লাটবেলাট ফুর্তিতে আছেন !
এর একটা বিহিত চান ?
তাহলে আরম্ভ হোক
সমস্বরে প্রচণ্ড চিৎকার।
কলকাতা-লণ্ডনে সান্‌ফ্রান্সিসকো-ব্রাজিলে
গলার সব-কটি শিরা ফুলিয়ে, হাত-পা ছুঁড়ে
আমাদের ধুন্ধুমার চিৎকারে চিৎকারে
ঊর্ধ্বে-নিম্নে, ডাইনে-বাঁয়ে, সবদিকে পৃথিবী
ওসারে বাড়তে থাকবে।
চারদিকে এতখানি উদ্বৃত্ত শূন্যতা
তারই সামান্য অংশ জবরদখল করে
অনন্তশয়ান ব্রহ্মা টের পেতে পেতে
একটু ফাঁকা, পরিসরে একটু বড়োসড়ো
ভূমণ্ডলে বেঁচে যাবো ক্রমাগত অনেক পুরুষ
ইচ্ছেমত
দীর্ঘদিন
হাঁফ ছেড়ে
আরামে ॥

বাঁচার কবিতা

তরুণ মুখোপাধ্যায়

'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' : আপ্তবাক্য ঠিক ;
অন্ততঃ আমরা সবাই দ্বৈতবাদী—দিনে আর রাতে
এই সত্য মেনে চলি। ফলতঃ জীবন-পথিক
হয়েও আমরা বেতাল নই ; যদিও মাতাল জাতে।
এবং তখনই দেখি দেশের হাওয়া, পার্টি কিংবা দল
যে রকম ঘুরে যায়, আমাদেরও হাতের পতাকা
হাওয়া-মোরগের মতো ঘুরে চলে অনর্গল,
কখনো তেরঙ্গা, কখনো লাল—কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা !
অবশ্যই ছাপোষা আমরা যারা, এই রূপান্তরে
বরাবর লাভ ছাড়া কখনো বুঝি নি কোনো ক্ষতি ;
দেশনেতা, মন্ত্রীবর যখন যেদিকে নড়ে চড়ে,
তার সাথে দুলে ওঠা বুঝেছি প্রগতি।
তাই তো এখন আমি সুসভ্য যথার্থ নাগরিক—
যে পাত্রে রাখা যাবে, থেকে যাব অবিকার ;
ব্যাঙ্কে যা রেখেছি তাতে এ জীবন কেটে যাবে ঠিক ,
'এ লড়াই বাঁচার লড়াই'—বুঝেছি বিকল্প নেই তার।

শরৎ প্রদক্ষিণ

দ্বিষাশক্তি চৌধুরী

॥ ৩ ॥

এর পরের দৃশ্য, পরিকল্পনায় তথা নির্মাণে এবং পরোৎকর্ষে, একমাত্র শরৎচন্দ্রেরই যোগ্য। একমাত্র বঙ্কিম ও শেক্‌স্‌পীয়রের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক দৃশ্যেই এর প্রতিতুলনা মিলতে পারে।

গভীর রাত্রিতে পঞ্চদশী পার্বতী একখানি বিছানার চাদরে সর্বাঙ্গ ঢেকে দেবদাসের শয়নকক্ষে উপস্থিত। নিদ্রিত দেবদাস হঠাৎ জেগে উঠে বিহ্বল ও বিমূঢ়, কিঞ্চিৎ শঙ্কিতও—কারণ সে এখন সুনাম দুর্নাম সম্বন্ধে খুব সচেতন ; বিশেষ যার বিবাহ আসন্ন সেই পার্বতীর সামাজিক সুনাম এক্ষেত্রে খুবই বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু পার্বতী স্থির অকম্পিত। তুমিই আমার সুনাম—তুমিই আমাকে এখন রক্ষা করবে। কিন্তু দেবদাসের এখন আর অতো সাহস ও আত্মবিশ্বাস নাই। সে বলে, এখন কি আর ছেলেমানুষি করার বয়স আছে? পার্বতীর নৈশ অভিযানের কারণ শুনেও সে সাহস করে' ভরসা দিয়ে কিছু বলতে পারে না। পার্বতী তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আকুল কেঁদে বলে, দেবদা'গো, একটু চরণে স্থান দাও। আমার যে আর গতি নাই। কলঙ্কের সম্ভাবনার কথায় বলে, নদীতে কতো জল দেবদা, অতো জলেও কি আমার 'কলঙ্ক' যাবে না? দেবদাস পার্বতীর হৃদয়বেদনা ও অসহায়তা বুঝতে পারে। তার আপন হৃদয় দিয়েই বুঝতে পারে। কিন্তু একমাত্র বাপ মাকে বুঝিয়ে মত করার আশ্বাস দেওয়া ছাড়া আর কোনো দৃঢ় পৌরুষব্যঞ্জক কিছু বলতে পারে না। সে তখনও তার হৃদয়কে সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নি। তার সামাজিক সত্তা তার বুদ্ধিকে তখনও আচ্ছন্ন করে আছে বলে আপন হৃদয়ের প্রবলতম ও অন্তরতম সত্য তার কাছে ঈষৎ অবগুণ্ঠিত। তবে তারও চৈতন্য হবে, আপন শূন্য হৃদয় ও শূন্য জীবনের অপরিসীম বেদনা তাকে আমরণ জাগিয়ে রাখবে। তবে সে সময় এখনো নয়।

এ দৃশ্যটির গভীর ও তীব্রবেগ নাটকীয়তা, ও হৃদয় সত্যের মর্মবিদারী আলেখ্য শরৎচন্দ্রের কলমেই এখানে কিছুটা তুলে ধরছি। শুধু বর্ণনা ও বিশ্লেষণে এর প্রবলতা, এর কারুণ্য, এর বেদনা, এর হাহাকার, এর সুগভীর মানবসত্য উপলব্ধ হওয়া সম্ভব নয়।—

পার্বতী ভিতরে আসিয়া দেখিল, দেবদাস শয্যায় নিদ্রিত। শিয়রের কাছে কি একখানা বই তখনও খোলা পড়িয়াছিল,—ভাবে বোধ হইল সে এইমাত্র যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সে দেবদাসের পায়ের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিল। দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটা শুধু টক্-টক্ শব্দ করিতেছে, ইহা ভিন্ন সমস্ত নিস্তব্ধ সমস্ত সুপ্ত।

পায়ের উপর হাত রাখিয়া পার্বতী ধীরে ধীরে ডাকিল, দেবদা—

দেবদাস ঘুমের ঘোরে শুনিতে পাইল, কে যেন ডাকিতেছে। চোখ না চাহিয়াই সাড়া দিল, উঁ—

ও দেবদা—

এবার দেবদাস চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। পার্বতীর মুখে আবরণ নাই। ঘরে দীপও উজ্জ্বল ভাবে জ্বলিতেছে; সহজেই দেবদাস চিনিতে পারিল। কিন্তু প্রথমে যেন বিশ্বাস হইল না। তাহার পর কহিল, একি! পারু না কি?

হাঁ, আমি।

দেবদাস ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখিল। বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় বাড়িল, কহিল, এত রাত্রে?

পার্বতী উত্তর দিল না, মুখ নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। দেবদাস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এত রাত্রে কি একলা এসেচ নাকি?

পার্বতী বলিল, হ্যাঁ!

দেবদাস উদ্বেগে আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া কহিল, পথে ভয় করেনি?

পার্বতী মৃদু হাসিয়া কহিল, ভূতের ভয় আমার তেমন করে না।

ভূতের ভয় না করুক, কিন্তু মানুষের ভয় ত করে। কেন এসেচ?……

বাড়ী ঢুকলে কি কোরে? কেউ দেখেনি ত?

দরওয়ান দেখেচে।

দেবদাস চক্ষু বিস্ফারিত করিল, দরওয়ান দেখেচে? আর কেউ? উঠানে চাকরেরা শুয়ে আছে—তাদের মধ্যেও কেউ দেখে থাকবে। দেবদাস বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। কেউ চিনতে পেরেচে কি? পার্বতী কিছুমাত্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ না করিয়া অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, তারা সবাই আমাকে জানে, হয়ত বা আমাকে চিনে থাকবে।

বল কি ? এমন কাজ কেন করলে পারু ?

পার্বতী মনে মনে কহিল, তা তুমি কেমন করে' বুঝবে ? কিন্তু কোন কথা কহিল না—অধোবদনে বসিয়া রহিল।

এত রাত্রে ! ছি—ছি ! কাল মুখ দেখাবে কেমন কোরে ?

মুখ নীচু করিয়াই পার্বতী কহিল, আমার সে সাহস আছে।

কথা শুনিয়া দেবদাস রাগ করিল না, কিন্তু নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, ছি-ছি—এখনও কি তুমি ছেলেমানুষ আছ ? এখানে, এভাবে আসতে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হ'ল না ?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া কহিল, কিছু না।

কাল তোমার লজ্জায় কি মাথা কাটা যাবে না ?

প্রশ্ন শুনিয়া পার্বতী তীব্র অথচ করুণ-দৃষ্টিতে দেবদাসের মুখপানে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া অসঙ্কোচে কহিল, মাথা কাটাই যেতো—যদি না আমি জানতুম, আমার সকল লজ্জা তুমি ঢেকে দেবে।

দেবদাস বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, আমি ! কিন্তু আমিই কি মুখ দেখাতে পারব ?

পার্বতী তেমনি অবিচলিত-কণ্ঠে উত্তর দিল, তুমি ? কিন্তু তোমার কি দেবদা ?

একটুখানি মৌন থাকিয়া পুনরায় কহিল, তুমি পুরুষমানুষ। আজ না হয় কাল তোমার কলঙ্কের কথা সকলে ভুলবে ; দুদিন পরে কেউ মনে রাখবে না—কবে কোন রাত্রে হতভাগিনী পার্বতী তোমার পায়ের উপর মাথা রাখবার জন্তে সমস্ত তুচ্ছ করে এসেছিল।

—ও কি পারু ?

আর আমি—

মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবদাস কহিল, আর তুমি ?

আমার কলঙ্কের কথা বলচ ? না—আমার কলঙ্ক নেই। তোমার কাছে গোপনে এসেছিলাম ব'লে যদি আমার নিন্দে হয়, সে নিন্দে আমার লাগবে না।

ওকি পারু ? কাঁদচ ?

দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না ? সহসা দেবদাস পার্বতীর হাত দুখানি ধরিয়া ফেলিল—পার্বতী !

পার্বতী দেবদাসের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া অবরুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল, এইখানে একটু স্থান দাও, দেবদা।

তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। দেবদাসের পা বহিয়া অনেক ফোঁটা অশ্রু শুভ্র শয্যার উপর গড়াইয়া পড়িল।

বহুক্ষণ পরে দেবদাস পার্বতীর মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, পারু, আমাকে ছাড়া কি তোমার উপায় নেই?

পার্বতী কথা কহিল না। তেমনি করিয়া পায়ের উপর মাথা পাতিয়া পড়িয়া রহিল। নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে শুধু তাহার অশ্রুব্যাকুল ঘন দীর্ঘশ্বাস দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। টং টং করিয়া ঘড়িতে দুইটা বাজিয়া গেল। দেবদাস ডাকিল, পারু!

পার্বতী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কি?

বাপ-মায়ের একেবারে অমত, তা শুনেচ?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া জবাব দিল যে, সে শুনিয়াছে। তাহার পর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর দেবদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবে আর কেন?

জলে ডুবিয়া মানুষ যেমন করিয়া অন্ধভাবে মাটি চাপিয়া ধরে, সেটা কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না, ঠিক তেমনি করিয়া পার্বতী অজ্ঞানের মত দেবদাসের পা দুটি চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। মুখপানে চাহিয়া কহিল, আমি কিছুই জানতে চাইনে দেবদা।

পারু, বাপ-মায়ের অবাধ্য হ'ব?

দোষ কি? হও।

তুমি তা হলে কোথায় থাকবে?

পার্বতী কাঁদিয়া কহিল, তোমার পায়ে—

আবার দুইজন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ঘড়িতে চারিটা বাজিয়া গেল। গ্রীষ্মকালের রাত্রি, আর অল্পক্ষণেই প্রভাত হইবে দেখিয়া দেবদাস পার্বতীর হাত ধরিয়া বলিল, চল, তোমাকে বাড়ী রেখে আসি।

আমার সঙ্গে যাবে?

ক্ষতি কি? যদি দুর্নাম রটে হয়তো কতকটা উপায় হতে পারে—

তবে চল।

উভয়ে নিঃশব্দ পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল।"

ছোট ছোট ভাঙা ভাঙা সংলাপ ও মাঝে মাঝে নীরবতার আধারে বিধৃত এ দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত, বাস্তব হয়ে ওঠে। দুটি হৃদয় একেবারে নিরাবরণ হয়ে প্রত্যক্ষগোচর হয়। একদিকে দেবদাস, অপ্রবুদ্ধ-হৃদয়, মূঢ়, অচেতন, এই মর্মন্তুদ বেদনা ও কঠিন সমস্যার সম্মুখে অসহায়বৎ ;— অন্যদিকে মরণান্তিক বেদনাবিদ্ধ সমস্যাকুল পার্বতীর স্বল্প কয়টি কথায় ও নিরুদ্ধ কান্নায় আর্ত হাহাকার। এ চিত্রায়নে যেমন অপূর্ব সাহস, তেমনি অপূর্ব শিল্পসংযমও প্রয়োজন হয়েছে। শুধু শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পক্ষেই এরূপ দৃশ্যের রচনা ও এরূপ রসসিদ্ধি সম্ভব।

এর পরেই দেবদাস পিতার কাছে কথাটির উত্থাপন করে, কিন্তু পিতার তিরস্কারলাঞ্ছিত হয়ে ও মাতার কাছে ক্রন্দন ছাড়া অন্য কোনো আশ্বাস না পেয়ে, হতাশ হয়ে কলকাতায় প্রস্থান করে। সেখানে গিয়ে দেবদাস এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। পার্বতীকে একটি অত্যন্ত হৃদয়হীন পত্রাঘাত করে' শুধু যে নিজের পিতামাতার অবাধ্য হবার অপারগতাই জানায় তাই নয়, পার্বতীর প্রতি তার নিজের ভালবাসাও যে তেমন প্রগাঢ় কিছু নয়, এই অপ্রয়োজনীয় মিথ্যাটিও যোগ করে' দিয়ে তাকে সব ভুলে যেতে বলে। মূর্খ দেবদাস ভেবেছিল পার্বতীর কল্যাণের জন্যই এই নিষ্ঠুর আঘাত প্রয়োজন। নিজের হৃদয়ের প্রতি তখনও সে সচেতন হয়নি। এর পরেই শুরু হলো তার অনুশোচনা আর ক্রমিক আত্মোপলব্ধি। পার্বতীর প্রতি তার অন্তরে চিরসঞ্চিত অপরিমেয় ভালবাসা উদ্বেল হয়ে উঠলো। যা সে এতদিন ভুলে ছিল তা-ই তাকে অস্থির করে তুললো। সে আবার গ্রামে ফিরে গেল। পার্বতী এদিকে ঐ পত্র পেয়ে রাগে অপমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে গেছে। সে আর দেবদাসের দিকে ভুলেও তাকায় না, দেখা হলেও এড়িয়ে চলে যায়। দেবদাস জানে যে, সে অন্যায় করেছে, এবং পার্বতীর ক্ষমা সে চায় ; কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার বিনতি তার অভ্যস্ত নয়। তা ছাড়া পার্বতীকে ছাড়া তারও যে চলবে না তার এই সত্য উপলব্ধির কথাও সে তাকে বলতে চায়। কিন্তু সে কৌশলও তার আয়ত্ত নয়। এই পরিস্থিতিতে একদিন দুজনের দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল। পার্বতী জল আনতে ঘাটে এসেছিল, দেবদাস তখন অদূরে একটা কুলগাছতলায় ছিপ ফেলে বসেছিল। দেবদাস পার্বতীকে ডাকলো। কিন্তু সব কথা গুছিয়ে বলার মতো সৌকর্য তার আয়ত্ত নেই। সে বোকার মতো আড়ষ্টভাবে বললো যে, সে ফিরে এসেছে পার্বতীরই জন্যে এবং এবার সে তার বাপ-মায়ের মত করে নেবেই। কিন্তু আগের চিঠির অপমানের স্মৃতিতে

পার্বতী জ্বলে উঠলো। বললো, তোমার বাপ-মায়ের মতটাই একমাত্র কথা নয়, আবার নিজের বাপ-মায়ের মতামতও আছে। তাঁরা এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। রাগের মাথায় আরও বললো, তোমার কেবল রূপ আছে গুণ নেই, আমার রূপও আছে. গুণও আছে। তোমার মতো 'অজ্ঞান, চঞ্চলচিত্ত, দুর্দান্ত' লোকের হাতে আমার বাপ-মা, আমার মঙ্গলকামী বলেই, আমাকে কিছুতেই দেবেন না। আমি যার কাছে যাচ্ছি তিনি ধনবান. বুদ্ধিমান, শান্ত এবং স্থির।

ঝগড়ার মুখে পার্বতীর মুখ দিয়ে এও বেরিয়ে গেল যে, দেবদাস সে-রাত্রের ঘটনা রাষ্ট্র করে দিয়ে তার অপবাদ রটিয়ে কিছু ক্ষতি করতে পারে বটে, কিন্তু তাতেও সে ভয় পায় না।

দেবদাস রাগে অন্ধ হয়ে গিয়ে বললো, মিথ্যে দুর্নাম রটাব আমি? তার পরেই ছিপের মোটা বাঁটটা সজোরে ঘুরিয়ে ধরে গর্জন করলো: পার্বতী, অতটা রূপ থাকা ভাল নয়, অহঙ্কার বড় বেড়ে যায়। এর পরে ছিপের সেই মোটা দিকটা দিয়ে পার্বতীর মাথায় সজোরে আঘাত করলো। পার্বতীর কপালের উপর ভুরু পর্যন্ত চিরে ক্ষত হয়ে গেল, রক্তে মুখ ভেসে গেল।

পার্বতী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বললো, দেবদা, কোরলে কি! দেবদাস তখন শান্ত হয়েছে। বললে, এ আঘাত তেমন বেশী কিছু নয়। শীঘ্র সেরে যাবে পারু, শুধু দাগ থাকবে। —দেবদাস নিজের জামার খানিকটা ছিঁড়ে পার্বতীর কপালে জলপটি বেঁধে দিল। আর বলল, শেষ বিদায়ের দিনে একটুখানি মনে রাখবার মত চিহ্ন রেখে গেলাম।

আকুল হয়ে কেঁদে পার্বতী বললে, দেবদা, কাউকে যেন বলো না। দেবদাস ঝুঁকে পড়ে পার্বতীর চুলে তার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করে বললো, তুই কি আমার পর পারু? দুষ্টুমি করলে ছেলেবেলায় কান মলে দিইনি?

পার্বতী বললে, আমায় মাপ কর দেবদা। দেবদাস বললে, সে কি তোকে বলতে হবে? কবে তোর উপর রাগ করে ছিলাম মাপ করিনি?

আখ্যানের এই চরম মুহূর্তে অদৃষ্টবিড়ম্বিত প্রণয়ীযুগলের এই ভাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে হৃদয়ের পুনর্মিলন ঘটলো। কিন্তু সামাজিক মিলনের আর তখন অবসর নেই। পার্বতীর বিয়ের দিন সন্নিকটবর্তী। এর অল্পদিন পরেই পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেল হাতীপোতার জমিদার, বিপত্নীক ভুবনমোহন চৌধুরীর সঙ্গে, যাঁর বয়স চল্লিশ, কাঁচাপাকা গোঁফ. আর আগের পক্ষের তিনটি বড়সড়ো ছেলেমেয়ে।

কী অপূর্ব সংযমের সঙ্গে এই তীব্র বেদনা-বিস্ফোরণময় দৃশ্যটিও এঁকেছেন

শরৎচন্দ্র। অতি সাধারণ উপকরণ দিয়ে এমন অসাধারণ বেদনার আলেখ্য রচনার শিল্প নৈপুণ্য অল্প লেখকের মধ্যেই মেলে। দেবদাসের এই দৃশ্যগুলির বিরল রসসৌন্দর্যের কথা মনে হলেই আমার বিস্ময় জাগে।

এরপর ট্র্যাজেডির ক্লাইমাক্স-পরবর্তী ঘটনাবলি। দেবদাস মদের নেশায় সব শূন্যতা ও হাহাকার ভোলার চেষ্টা করতে থাকে : পার্বতীও তার প্রৌঢ়স্বামীর সংসারে আদর্শ গৃহিনী হবার সাধনায় হৃদয়ের হাহাকারকে ভুলে থাকার চেষ্টা করে। এর মধ্যে বারবনিতা চন্দ্রমুখীর আবির্ভাব ঘটে। দেবদাস বেশ্যাদের ঘৃণা করলেও চন্দ্রমুখী দেবদাসকে ভালবেসে ফেলেছে। তারপর আর সে ঐ ব্যবসা করতে পারে না। দুচার জন পণ্ডিত চন্দ্রমুখীকে অবাস্তব ও কৃত্রিম বলেছেন। কিন্তু আমার তা কখনোই মনে হয় না। বেশ্যারাও ভালবাসতে পারে এবং ভালবাসলে যে একেবারে বদলে যায় এবং তাদের সে ভালবাসাও যে আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গে উচ্চতম সতীপ্রেমের সব লক্ষণাক্রান্ত হয়, সে কাহিনী অনেক শোনা যায়। এবং শরৎচন্দ্রের তুলিতে হৃদয়সত্যের রঙে তার একাধিক আলেখ্যও মেলে। চন্দ্রমুখী চরিত্র তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র এবং কারুণ্যে ও মাধুর্যে অনন্য।

ট্র্যাজেডির ক্রমগাঢ় তমিস্রার মধ্যে একটি দৃশ্য অপূর্ব উজ্জ্বল। দেবদাসের পিতৃবিয়োগ হয়েছে, সে অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধশান্তির প্রয়োজনে বাড়ীতে ফিরে এসেছে। খবর পেয়ে পার্বতীও এসেছে বাপের বাড়ীতে, দেবদাসের শোকে সান্ত্বনা দেবে, এবং দেবদা সম্বন্ধে যে সব নানা দুর্নাম শুনেছে, সে বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' তার ছন্নভ্রষ্ট জীবনকে এই আত্মহনন থেকে, যদি বাঁচাতে পারে তার চেষ্টা করবে। শ্রাদ্ধাদি মিটে যাবার পরে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে পার্বতী আবার গেল দেবদাসের শয়নকক্ষে। সেই দৃশ্যটিও এখানে তুলে দিচ্ছি।—

> "এখনও সন্ধ্যা হইতে কিছু বিলম্ব আছে—পার্বতী দেবদাসের ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। দেবদাস শয্যায় বসিয়া হিসাব দেখিতেছিল, চাহিয়া দেখিল। পার্বতী ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া মেঝের উপর বসিল। দেবদাস মুখ তুলিয়া হাসিল, তাহার মুখ বিষণ্ণ, কিন্তু শান্ত। হঠাৎ কৌতুক করিয়া কহিল, যদি অপবাদ দিই ?
>
> পার্বতী সলজ্জ নীলোৎপল চক্ষু দুটি একবার তাহার পানে রাখিয়া পরক্ষণেই অবনত করিল। মুহূর্তে বুঝাইয়া দিল, একথা তাহার বুকের মাঝে চিরদিনের মত বিঁধিয়া আছে। আর কেন ? কত কথা বলিতে

আসিয়াছিল ; সব ভুলিয়া গেল। দেবদাসের কাছে সে কথা কহিতে পারে না।

আবার দেবদাস হাসিয়া উঠিল, কহিল, বুঝেচি রে, বুঝেচি। লজ্জা হচ্ছে, না ?

তবুও পার্বতী কথা কহিতে পারিল না। দেবদাস কহিতে লাগিল, তাতে আর লজ্জা কি ? দু'জনে মিলেমিশে একটা ছেলেমানুষি করে ফেলে—এই দেখ দেখি—মাঝ থেকে কি গোলমাল হয়ে গেল ; রাগ করে তুই যা ইচ্ছে তাই বললি ; আমিও কপালের উপর ঐ দাগ দিয়ে দিলাম। কেমন হয়েছে !

দেবদাসের কথার ভিতরে শ্লেষ বা বিদ্রূপের লেশমাত্র ছিল না ; প্রসন্ন হাসিমুখে অতীতের দুঃখের কাহিনী। পার্বতীর কিন্তু বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুখে কাপড় দিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া মনেমনে বলিল, দেবদাদা, ঐ দাগই আমার সান্ত্বনা, ঐ আমার সম্বল। তুমি আমাকে ভালবাসতে—তাই দয়া ক'রে আমাদের বাল্য-ইতিহাস ললাটে লিখে দিয়েচ। ও আমার লজ্জা নয়, কলঙ্ক নয়, আমার গৌরবের সামগ্রী।

পাক !

মুখ হইতে অঞ্চল না খুলিয়া পার্বতী কহিল, কি ? তোর উপর আমার বড় রাগ হয়—

এইবার দেবদাসের কণ্ঠস্বর বিকৃত হইতে লাগিল—বাবা নেই, আজ আমার কি দুঃখের দিন ; কিন্তু তুই থাকলে কি ভাবনা ছিল ! বড় বৌকে জানিস্ ত, দাদার স্বভাবও কিছু তোর লুকানো নেই ; বল্ দেখি, মাকে নিয়ে এ সময়ে কি করি ! আর আমরাই বা যে কি হবে, কিছুই বুঝতে পাই না। তুই থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে—তোর হাতে ফেলে দিয়ে—ওকি রে পাক !

পার্বতী কোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। দেবদাস কহিল, কাঁদছিস্ বুঝি ? তবে আর বলা হ'ল না।

পার্বতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বল।

দেবদাস মুহূর্ত্তে কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া লইয়া কহিল, পাক, তুই নাকি খুব পাকা গিন্নি হয়েচিস্ রে ?

ভিতরে ভিতরে পার্বতী চাপিয়া অধর দংশন করিল ; মনে মনে বলিল, ছাই গৃহিনী ; শিমুলফুল দেবদেবায় লাগে কি ?

দেবদাস হাসিয়া উঠিল ; হাসিয়া কহিল, বড় হাসি পায়। ছিলি তুই এতটুকু—কত বড় হলি। বড় বাড়ী, বড় জমিদারী, বড় বড় ছেলেমেয়ে আর, চৌধুরীমশাই, বড়—কিয়ে পারু !

চৌধুরীমশাই পার্বতীর বড় আদরের জিনিস ; তাঁকে মনে হইলেই তার হাসি পাইত। এত কষ্টেও তার হাসি আসিল। দেবদাস কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, একটা উপকার করতে পারিস্ ?

পার্বতী মুখ তুলিয়া কহিল কি ?

তোদের দেশে ভাল মেয়ে পাওয়া যায় ?

পার্বতী ঢোক গিলিয়া, কাশিয়া বলিল, ভাল মেয়ে ? কি করবে ?

পেলে বিয়ে করি। একবার সংসারী হতে সাধ হয়।

পার্বতী ভালমানুষটির মত কহিল, খুব সুন্দরী ত ?

হ্যাঁ, তোর মত।

আর খুব ভালমানুষ ?

না খুব ভালমানুষে কাজ নেই, বরং একটু দুষ্টু,—তোর মত আমার সঙ্গে যে ঝগড়া করতে পারবে।

পার্বতী মনে মনে বলিল, সে ত কেউ পারবে না দেবদাদা, কেননা, তাতে আমার মত ভালবাসতে পারা চাই। মুখে কহিল, পোড়ার মুখ আমার, আমার মত কত হাজার হাজার মেয়ে তোমার পায়ে আসতে পেলে ধন্য হয়।

দেবদাস কৌতুক করিয়া হাসিয়া বলিল, একটি আপাততঃ দিতে পারিস দিদি ?

দেবদাদা সত্যি বিয়ে করবে ?

এই যে বললাম।

শুধু এইটি খুলিয়া বলিল না যে, তাকে ভিন্ন এজীবনে অন্য স্ত্রীলোকে প্রবৃত্তি হইবে না।

দেবদাদা একটি কথা বলব ?

কি ?

পার্বতী আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া কহিল, তুমি মদ খেতে শিখলে কেন ?

দেবদাস হাসিয়া উঠিল ; কহিল, খেতে কি কোন জিনিস শিখতে হয় ?

তা নয়, অভ্যাস করলে কেন ?

কে বলেচে, ধর্মদাস ?

যেই বলুক, কথাটা কি সত্যি ?

দেবদাস প্রতারণা করিল না ; কহিল, কতক বটে।

পার্বতী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত হাজার টাকার গহনা গড়িয়ে দিয়েচ না ?

দেবদাস হাসিয়া কহিল, দিইনি, গড়িয়ে রেখেচি। তুই নিবি ?

পার্বতী হাত পাতিয়া বলিল, দাও। এই দেখ আমার একটিও গহনা নেই।

চৌধুরী মশাই তোকে দেননি ?

দিয়েছিলেন ; আমি সমস্ত তাঁর বড় মেয়েকে দিয়ে দিয়েচি।

তোর বুঝি দরকার নেই ?

পার্বতী মাথা নাড়িয়া মুখ নীচু করিল।

এইবার সত্যসত্যই দেবদাসের চোখে জল আসিতেছিল। দেবদাস অন্তরে বুঝিতে পারিয়াছিল, কম দুঃখে আর স্ত্রীলোকে নিজের গহনা খুলিয়া বিলাইয়া দেয় না। কিন্তু চোখের জল চাপিয়া ধীরে ধীরে বলিল, মিছে কথা থাক। কোন স্ত্রীলোককেই আমি ভালবাসিনি, কাউকেই গহনা দিইনি।

পার্বতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, তাই আমি বিশ্বাস করি। অনেকক্ষণ দুই-জনেই চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর পার্বতী কহিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর—আর মদ খাবে না।

তা' পারিনে। তুমি কি প্রতিজ্ঞা করতে পার, আমাকে আর একটিবারও মনে ক'রবে না।

পার্বতী কথা কহিল না। এই সময়ে বাহিরে সন্ধ্যার শঙ্খধ্বনি হইল। দেবদাস চকিত হইয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া কহিল, সন্ধ্যা হল, এখন বাড়ী যা পারু।

আমি যাব না। তুমি প্রতিজ্ঞা কর।

আমি পারিনে।

কেন পার না ?

সবাই কি সব কাজ পারে ?

ইচ্ছে করলে নিশ্চয় পারে।

তুমি আমার সঙ্গে আজ রাত্রে পালিয়ে যেতে পার ?

পার্বতীর সহসা যেন হৃৎস্পন্দন রুদ্ধ হইয়া গেল। অজ্ঞাতসারে অস্ফুটে মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, তা' কি হয় ?

দেবদাস শয্যার উপর একটু সরিয়া বসিয়া কহিল, পার্বতী দোর খুলে দাও।

পার্বতী সরিয়া আসিয়া, দ্বারে পিঠ দিয়া ভাল করিয়া বসিয়া, বলিল, প্রতিজ্ঞা কর।

দেবদাস উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরভাবে কহিতে লাগিল, পারু, জোর করিয়ে প্রতিজ্ঞা করানটা কি ভাল, না, তাতে বিশেষ লাভ আছে ? আজকার প্রতিজ্ঞা কাল হয়ত থাকবে না—কেন আমাকে আর মিথ্যাবাদী করবি ?

আবার বহুক্ষণ নিঃশব্দে অতিবাহিত হইল। এমনি সময়ে কোথায় কোন্ ঘরের ঘড়িতে টং টং করিয়া নয়টা বাজিয়া গেল। দেবদাস ব্যস্ত হইয়া পড়িল ; কহিল, ওরে পারু, দোর খুলে দে।

পার্বতী কথা কহে না।

ও পারু !

আমি কিছুতেই যাব না, বলিয়া পার্বতী অকস্মাৎ রুদ্ধ-আবেগে সেইখানেই লুটাইয়া পড়িল—বহুক্ষণ ধরিয়া বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল। ঘরের ভিতর এখন গাঢ় অন্ধকার—কিছুই দেখা যায় না। দেবদাস শুধু অনুমান করিয়া বুঝিল, পার্বতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতেছে—ধীরে ধীরে ডাকিল, পারু !

পার্বতী কাঁদিয়া উত্তর দিল, দেবদা, আমার যে বড় কষ্ট।

দেবদাস কাছে সরিয়া আসিল। তাহার চক্ষেও জল—কিন্তু স্বর বিকৃত হইতে পায় নাই। কহিল, তা কি আর জানিনে রে ?

দেবদা, আমি যে মরে যাচ্ছি। কখনো তোমার সেবা করতে পেলাম না,—আমার যে আজন্মের সাধ—

অন্ধকারে চোখ মুছিয়া দেবদাস কহিল, তারও ত সময় আছে।

তবে আমার কাছে চল ; এখানে তোমাকে দেখবার যে কেউ নেই।

তোর বাড়ী গেলে খুব যত্ন করবি ?

আমার ছোটবেলার সাধ ! স্বর্গের ঠাকুর ! আমার এ সাধটি পূর্ণ করে দাও। তারপর মরি—তাতেও দুঃখ নেই।

এরপর দেবদাসের চোখেও জল আসিয়া পড়িল।

পার্বতী পুনরায় কহিল, দেবদা, আমার বাড়ী চল।

দেবদাস চোখ মুছিয়া বলিল, আচ্ছা যাব।

আমাকে ছুঁয়ে ব'ল, যাবে ?

দেবদাস অনুমান করিয়া পার্বতীর পদপ্রান্ত স্পর্শ করিয়া বলিল, একথা কখনও ভুলব না। আমাকে যত্ন করলে যদি—তোমার দুঃখ ঘুচে—আমি যাব। মরবার আগেও আমার একথা স্মরণ থাকবে।"

আপন আপন অদৃষ্টের কারাগারে বন্দী ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন এই দুই হতভাগ্যের কী যে অসহনীয় আর্তি এখানে এই হাসিঅশ্রুময় ভাঙ্গা সংলাপে উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে তার তুলনা শরৎসাহিত্যেও পাইনা।

এরপর আবার দেবদাসের সুরাস্রোতে ভেসে যাওয়ার পুনরাবৃত্তি। দেহও অত্যাচারে ব্যাধিজর্জর। সমস্ত ইচ্ছাশক্তি বিসর্জন দিয়ে সে অবধারিত মৃত্যুর মোহানার দিকে এগিয়ে চলেছে। সেই নীরন্ধ্র হতাশার, হালভাঙা তরণীর অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ছুটে যাওয়ার দৃশ্যগুলিও অত্যন্ত বেদনার। শুধু শরৎচন্দ্রের শিল্পসংযমই আমাদের ঐ দুঃসহ করুণ দৃশ্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি করে রাখে। এই শেষের দিকে চন্দ্রমুখীর চরিত্রটি আরও উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়ে উঠেছে এবং ট্র্যাজেডির ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে বৈচিত্র্য ও কারুণ্যের দীপ্তি সঞ্চার করেছে। আর দেবদাসের ভৃত্য ধর্মদাসের ব্যাকুল প্রভুভক্তির সকরুণ বেদনাও একটি শুচি নির্মল আভা বিস্তার করেছে।

ট্র্যাজিক নিয়তির অন্তিম আবর্তও দ্রুত গতিতে এগিয়ে এল। মৃত্যুপথযাত্রী দেবদাস কিন্তু পারুর কাছে অঙ্গীকার রক্ষার জন্য, ঘুমন্ত ধর্মদাসকে ট্রেনে ফেলে রেখে, ভঙ্গুর দেহখানি কোনো মতে টেনে, পাণ্ডুয়া ষ্টেশনে নামলো—উদ্দেশ্য পার্বতীর শ্বশুরবাড়ী হাতীপোতায় গিয়ে, মৃত্যুর পূর্বে পার্বতীকে শেষ দেখা দেওয়া। কিন্তু সেই বিড়ম্বিত যাত্রা যখন শেষ হলো তখন তার অন্তিম মুহূর্তও উপস্থিত। এক অশ্বত্থতলায় খড়ের শয্যায় আত্মীয়বন্ধুস্বজনবিরহিত মৃত্যুর ক্রোড়ে তার ভবযন্ত্রণা শেষ হোল। পার্বতী কিছুই জানে না। এক অপরিচিত ধনী ব্যক্তি গাছতলায় মরে আছে শুনলো মাত্র। পরে যখন ক্রমে মৃতের পরিচয়ের আভাস সে অবগত হোল তখন সে উন্মাদের মতো ছুটলো দেবদাসকে দেখতে। কিন্তু ততক্ষণে দেবদাসের মৃতদেহ ডোমে নিয়ে গেছে শ্মশানে দাহ করবে বলে'। জমীদারের গৃহিনীকে কেউ সেদিকে যেতে দিল না, ধরে রাখলো। পার্বতী মূর্ছিতা হয়ে পড়ে রইলো। তারপরের কাহিনী আর নাই।

এই ট্র্যাজিক প্রেমের কাহিনীর অনুরূপ কোনো কাহিনী বা নাটক আমার চোখে পড়েনি। বঙ্কিমের "চন্দ্রশেখরে" প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্য প্রণয়ের ও তার ট্র্যাজেডির কাহিনী আছে। কিন্তু বঙ্কিম তার ট্র্যাজিক রস নানা ইতিহাসের সঙ্কটের আবর্তের মধ্যে ফেলে ফিকে করে দিয়েছেন এবং শেষে শৈবলিনীর নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ প্রায়শ্চিত্তের মাঝে তাকে কবর দিয়েছেন। শেক্সপীয়রের "রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট"-ও নিয়তিবিড়ম্বিত প্রণয় কাহিনী। বাল্য প্রণয়ের না হলেও নবযৌবনের উদ্দাম প্রেমের নাট্যকাব্য। কিন্তু নাটকে কাহিনীর বিস্তারের অবকাশ কম, তায় উপর শেক্স্‌পীয়র তখনও শিল্প-পারঙ্গমতায় অজিতসিদ্ধি হন নি। কয়েকটি দৃশ্যের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও এ ট্র্যাজেডি মহৎ শিল্প হয়ে ওঠে নি। 'দেবদাসে'র বিস্তার ও গভীরতা, তার ট্র্যাজেডির অপরিসীম কারুণ্য, দুটি সুন্দর ও অসাধারণ জীবনের একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার হৃদয়বিদারক দৃশ্য—এর তুলনা দেখিনা। এর সৌন্দর্য ও বেদনা মনকে যেমন অভিভূত করে, তেমনি মানুষের আপন স্বভাবনিহিত নিয়তির রহস্যসম্বন্ধেও অবহিত করে।

ঈশ্বর ও মানবাদৃষ্টের মহারহস্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ মহৎ ট্র্যাজেডির লক্ষণ বলে কথিত। শরৎচন্দ্র ঐ সব অজ্ঞেয় রহস্যের আভাস দেননি তাঁর কোনো উপন্যাসে। তবে মানুষের মন নামক অতিসংবেদী সুকুমার বস্তুটির প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তারই বেদনার নানা কাহিনী তিনি এঁকেছেন। সবই অপূর্ব। তবে 'দেবদাসের' মতো এমন করুণ সুন্দর এবং তীব্র হাহাকারভরা বেদনার কাহিনী তিনিও আর আঁকতে পারেন নি।

বাঙ্গালীর শেক্‌স্‌পীয়রচর্চা

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

বিশ্ববন্দিত ইংরাজ নাট্যকার উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়র, ইংরাজী শিক্ষা এদেশে প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা আরও পূর্ব থেকেই, নাট্যরস-পিপাসু বাঙ্গালীর হৃদয় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেছিলেন। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্যালকাটা থিয়েটার বা ওল্‌ড্‌ প্লে হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নিউ প্লে হাউস। এখানে ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ, রোমিও জুলিয়েট, কিং লীয়র, হ্যামলেট্‌ প্রভৃতি নাটকগুলি মহাসমারোহে অভিনীত হয়। পরে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার', 'সাঁ সুসি' প্রভৃতি অনেকগুলি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেকালের নাট্যরসিক বিশিষ্ট বাঙ্গালীরা এই সকল অভিনয় দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। চৌরঙ্গী থিয়েটারের অন্যতম পরিচালক ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। মহারাজা রাধাকান্ত দেব, মহারাজা বৈদ্যনাথ রায়, মহারাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির উদ্যোগে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট সাঁ সুসি থিয়েটারে ওথেলো নাটকের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বঙ্গসন্তান বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির ছাত্রদের দ্বারা ওরিয়েণ্টাল থিয়েটারে ওথেলো নাটকের অভিনয়ে প্রিয়নাথ মৈত্র ইয়াগো, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ডেসডিমোনা ও দীননাথ ঘোষ ওথেলো অভিনয়ে দর্শকদের মন জয় করেছিলেন। 'ডেভিড্‌ হেয়ার একাডেমি'র ছাত্রগণ ১৮৫৩ সালে মার্চেণ্ট অফ্‌ ভেনিস্‌ অভিনয় করেছিলেন। এছাড়াও ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলিকাতায় ও কলিকাতার বাহিরে নানা স্থানে নানা নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাবলীর অভিনয় হয়েছে।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে ছাত্রগণ অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের অমর সৃষ্টির সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। ইংরাজী শিক্ষাসত্রের দুই স্বনামধন্য হোতা, ডিরোজিও ও রিচার্ডসন, স্বকীয় ভঙ্গীতে অপূর্ব বাগ্মিতায় শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক ব্যাখ্যা করে ছাত্রদের মুগ্ধ করে রাখতেন। রিচার্ডসনের শেক্‌স্‌পীয়র আবৃত্তি কিম্বদন্তী হয়ে উঠেছিল। হিন্দুকলেজের শেক্‌স্‌পীয়র-অভিনয়ে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্ররাও শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অভিনয় করেছিলেন। ১৮০১ সালে ইংরাজী শিক্ষিত

বাঙ্গালী যুবকেরা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারিকেলডাঙ্গার বাগান বাড়ীতে জুলিয়াস সিজারের অভিনয় দিয়ে হিন্দু থিয়েটারের উদ্বোধন করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর হুগলী গরিফার বাগান বাড়ীতে হ্যামলেটের অভিনয়ে স্বয়ং হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অভিনয় করেছিলেন জেনারেল এসেম্‌ব্লির ছাত্ররাও। তাঁরা ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়াস সিজার এবং ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চেণ্ট অফ্‌ ভেনিস্‌ অভিনয় করেছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রথম অভিনয়ে ব্রুটাস্‌ এবং দ্বিতীয় অভিনয়ে এ্যাণ্টোনিওর ভূমিকায় এবং নরেশ মিত্র শাইলকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

শেক্‌স্‌পীয়রচর্চা বঙ্গদেশে বিভিন্নধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে উনিশ শতকের সূচনা থেকে বিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত। (১) শেক্‌স্‌পীয়রের মূল নাটকের অভিনয়, (২) শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাবলীর নাট্যাকারে অনুবাদ ও অনূদিত নাটকের অভিনয়, (৩) গদ্য আখ্যায়িকার আকারে ভাবানুবাদ, (৪) ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় গবেষণামূলক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা, (৫) বাঙ্গালা নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাবকে পরম শ্রদ্ধায় বরণ করা, (৬) দেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের তুলনামূলক আলোচনা —এই ছয়টি ধারায় শেক্‌স্‌পীয়র চর্চা বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে।

বাঙ্গালা নাটকের প্রথম যুগ থেকেই শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকসমূহের অনুবাদের জোয়ার এসেছিল। হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' নামে মার্চেণ্ট অফ্‌ ভেনিস (১৮৫২) এবং 'চারুমুখচিত্তহরা' নামে রোমিও জুলিয়েট (১৮৬১) অনুবাদ করে সাধারণ বাঙ্গালীর সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়রকে পরিচিত করেছিলেন। ভানুমতী চিত্তবিলাসের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "……to convey to my Countrymen, who have no means of getting themselves acquainted with Shakespeare…… the beauty of the author's sentiments as expressed in the best passages in the play……"। সিম্বেলিনের অনুবাদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বীরসিংহ' ও চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। কুসুমকুমারী ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। বেণীমাধব ঘোষ রচিত কমেডি অফ্‌ এররস্‌-এর অনুবাদ 'ভ্রমকৌতুক' প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। তারিণী পাল কৃত 'ভীমসিংহ' (১২৮১), প্রমথনাথ বসুর 'অমরসিংহ' (১৮৭৪) ও হরলাল রায়ের 'রুদ্রপাল' (১৮৭৪) হ্যামলেটের অনুবাদ। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেছিলেন

রোমিও জুলিয়েট ও 'নলিনীবসন্ত' নামে টেম্পেষ্ট (১২৭৫)। যোগেন্দ্রনাথ দাসের রোমিও জুলিয়েটের অনুবাদ 'বিলাসবতী' (১৮৬৮), মার্চেণ্ট অফ্‌ ভেনিসের প্যারীলাল মুখোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ 'সুরলতা' (১৮৭৭), জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর অনূদিত জুলিয়াস সিজার (১৩১৪), তারিণী পাল কৃত ওথেলোর অনুবাদ 'ভীমসিংহ' (১২৮১), তারকনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত ম্যাকবেথ (১৮৭৫), চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত টেম্পেষ্টের অনুবাদ 'প্রকৃতি নাটক' (১৮৮০-৮৪) প্রভৃতি শেক্‌স্‌পীয়র চর্চার ব্যাপকতা প্রমাণিত করে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ ম্যাকবেথ অনুবাদ করে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মাত্র চোদ্দ বৎসর বয়সে ম্যাকবেথের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শেষজীবনে কবিত্বময় আক্ষরিক অনুবাদ করেছিলেন জুলিয়াস সিজার, ওথেলো, ম্যাকবেথ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির। বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত ও প্রকাশিত প্রেমকুঞ্জ গ্রন্থে রোমিও জুলিয়েট, ওথেলো ও ইষ্টলেনের সংক্ষিপ্তসার সংকলিত হয়েছে।

বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম সার্থক শিল্পী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস আস্বাদনে তৎপর ছিলেন। কমেডি অফ্‌ এরর্‌স্‌-এর মনোহর গদ্যে মর্মানুবাদ 'ভ্রান্তিবিলাস' (১৮৬৯) তাঁর অন্যতম কীর্তি। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন, "শেক্‌স্‌পীয়র পঁয়ত্রিশ খানি নাটকের রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত ও চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত নাটকসমূহে কবিত্বশক্তির ও রচনাকৌশলের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত তিনি চারিখানি খণ্ড কাব্য ও কতকগুলি ক্ষুদ্রকাব্য রচনা করিয়াছেন।..... ভ্রান্তিপ্রহসন কাব্যাংশে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রণীত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট, কিন্তু উহার উপাখ্যানটি যার পর নাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরস উদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে শেক্‌স্‌পীয়রের সেই অপ্রতিম কৌশল নাহি,.....।" শেক্‌স্‌পীয়রের রচনাবলী বিদ্যাসাগর কি গভীর মনোযোগের সঙ্গে অনুশীলন করেছিলেন এই মন্তব্য তারই সাক্ষ্য দান করে।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত বড়দের উপযোগী ও ছোটদের উপযোগী শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের গদ্যে মর্মানুবাদ হয়েছে অজস্র। বিদ্যাসাগরেরও পূর্বে স্কুলবুক সোসাইটি ল্যাম্বের Tales from Shakespeare অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে। গুরুদাস হাজরার

'রোমিও জুলিয়েটের মনোহর উপাখ্যান' (১৮৪৮), মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের অপূর্বোপাখ্যান (নাটকের গল্প ১৮৫২), ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি প্রকাশিত শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের মর্মানুবাদ (১৮৫৩), যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় রচিত শেক্‌স্‌পীয়রের গল্প (১৮৮৭), নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী রচিত সুদখোর সওদাগর, মহাদেব দে প্রণীত ভেনিস বণিক (১৯২৫), খগেন্দ্রনাথ মিত্র রচিত ঝড় (১৯২৫) ও শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের গল্প (১৯৫৬), বিমল দত্ত প্রণীত শেক্‌স্‌পীয়রের গল্প (১৯৪০), নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত রচিত ছোটদের শেক্‌স্‌পীয়র, শিশিরকুমার নিয়োগী লিখিত শেক্‌স্‌পীয়রের গল্প (১৯৫৬), অশোকগুহ কৃত কিশোরদের উপযোগী শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকাবলীর অনুবাদ ইত্যাদি বহু গল্পগ্রন্থ রচিত হয়েছে। হিতবাদী সংস্থা ও বসুমতী সাহিত্যমন্দির দীর্ঘকাল শেক্‌স্‌পীয়রের অনূদিত গ্রন্থাবলী সুলভ মূল্যে প্রচার করেছে। সাম্প্রতিক কালেও কলিকাতার বহু প্রকাশন সংস্থা শেক্‌স্‌পীয়রের অনূদিত গ্রন্থাবলী প্রকাশ করছেন।

বাঙ্গালা নাটকের আদিযুগ থেকেই শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাট্যকলা অনুসরণের প্রয়াস দেখা যায়। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জি. সি. গুপ্তের কীর্তিবিলাস ও তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন প্রথম মৌলিক বাঙ্গালা নাটক। এই দুই নাটকেই সেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরীতি প্রয়োগের অসার্থক প্রয়াস দেখা যায়। 'কীর্তিবিলাস' চরিত্রে হ্যামলেটের প্রভাব বর্তমান। হিন্দু কলেজের স্বনামধন্য অধ্যাপক রিচার্ডসনের ছাত্র মাইকেল মধুসূদনও শেক্‌স্‌পীয়রভক্ত ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বন্ধু গৌরদাস বসাককে শেক্‌স্‌পীয়র রচনাবলী পাঠাতে অনুরোধ করেছিলেন। হিন্দুকলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি অংক কষে প্রমাণ করেছিলেন যে শেক্‌স্‌পীয়র ইচ্ছা করলেই নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন ইচ্ছা করলেই শেক্‌স্‌পীয়র হতে পারতেন না। মৃত্যুর পূর্বেও তিনি ম্যাকবেথের উক্তি আবৃত্তি করেছেন—

To-morrow and to-morrow, and to-morrow,
Creeps in this petty pace from day to day,
To the last syllable of recorded time ;
And all our yesterdays have lighted fools
The way to dusty death. Out, out—brief candle;
Life's but a walking shadow ; a poor Player,…

নাট্যরচনাকালে তিনি যে সংস্কৃত নাট্যরীতি বর্জন করে পাশ্চাত্যরীতি গ্রহণ করেছেন সে কথা স্পষ্টভাবেই একটি পত্রে বলেছেন, "I shall look to

the great dramatists of Europe for models." শর্মিষ্ঠা নাটক প্রসঙ্গে তিনি বন্ধু গৌরদাসকে লিখেছেন, "I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my drama···" সংস্কৃত ও গ্রীক নাট্যকলার সঙ্গে শেক্‌স্‌পীরীয় নাট্যকলাকেও তিনি সমীকরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। শর্মিষ্ঠা নাটকে দেবযানী ও সখী পূর্ণিকার ছদ্মবেশে শুক্রাচার্যের নিকট গমন, 'As You Like It' নাটকের ছায়ায় কল্পিত। কৃষ্ণকুমারী নাটকের মদনিকা উক্ত নাটকের গ্যানিমেড্‌ ও Merchant of Venice-এর পোর্শিয়া, ভীমসিংহ King Lear, বলেন্দ্রসিংহ The Life and Death of King John-এর ফিলিপ্‌, দি ব্যাষ্টার্ড. এবং Life and Death of Henry IV নাটকের হট্‌স্পার চরিত্রের অনুস্থতি। দীনবন্ধুর সধবার একাদশী নাটকের নিমচাঁদ অনর্গল শেক্‌স্‌পীয়র আবৃত্তি করেছে। তাঁর নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) নাটকে Merry Wives of Windsor নাটকের ছায়া আপতিত। জলধর চরিত্রে ফলষ্টাফ্‌, মল্লিকা চরিত্রে মিসেস পেজ্‌ ও মালতী চরিত্রে মিসেস ফোর্ডকে চেনা যায়। লীলাবতী নাটকে ললিত ও ললিতার চরিত্রে রোমিও জুলিয়েট্‌ এবং কমলে কামিনী নাটকে ম্যাকবেথের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তীর নন্দবংশোচ্ছেদ নাটকে হ্যামলেট, গিরিশচন্দ্রের জনা চরিত্রে রিচার্ড দি থার্ড নাটকের রাজা ষষ্ঠ হেনরীর বিধবা পত্নী মার্গারেট্‌, মীরকাশেম নাটকে বেগম চরিত্রে জুলিয়াস সিজারের পোর্শিয়া, সিরাজদ্দৌল্লা চরিত্রে কিং রিচার্ড দি সেকেণ্ড, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অশ্রুমতী নাটকে অশ্রুমতীর চরিত্রে লেডি ম্যাকবেথ, ও ক্লিয়োপেট্রা, ফরিদর্খার চরিত্রে ইয়াগো এবং সেলিমের চরিত্রে ওথেলো চরিত্রের প্রভাব সুস্পষ্ট।

বাঙ্গালার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটককেই নাট্যরচনার আদর্শরূপে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন। তাঁর বিভিন্ন নাটকে শেক্‌স্‌পীয়ারের সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর সৃষ্ট নূরজাহান চরিত্রে লেডি ম্যাকবেথ, সাজাহানে কিং লীয়র ও দিলদার চরিত্রে কিং লীয়রের Fool প্রভাব সঞ্চার করেছে। বাল্যকাল থেকেই দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়রের অনুরাগী। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের অভিনয় দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যকলা তিনি ব্যাপকভাবে সার্থকতার সঙ্গে নাটকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। এই বিদেশী নাট্যকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি লিখেছেন,"····· দূর গঙ্গাতীর-

বাসী আর্যাবর্তের শ্যামল সন্তান তোমাকে ভারতীর বরপুত্র কালিদাসের প্রিয় ভ্রাতা, জগতের প্রিয় কবি বলিয়া আলিঙ্গন ও আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিবে।" দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সংলাপও স্থানে স্থানে শেক্‌স্‌পীয়রীয় সংলাপের ভাবানুবাদ বলে মনে হয়। যেমন: যা কখনও ভাবিনি এমন ব্যাপার পৃথিবীতে অনেক ঘটে (পরপারে—৩।১)। তুলনীয়: There are more things in Heaven and Earth, than are dreamt of in your Philosophy. (হ্যামলেট ১।৪)। উন্মত্ততার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে (নূরজাহান ৫।৮)। তুলনীয়: Though this be madness, yet there is method in it (হ্যামলেট ২।২)। দে বেটারা খুব দে, খুব দে·····(সাজাহান—২।২)। তুলনীয়: B)ow Winds, and Crack your Cheeks! Rage! Blow! (কিং লীয়র ৩।২)।

গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপেও শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব লক্ষিত হয়। শেক্‌স্‌পীয়রের ট্রাজেডিকেও তিনি সিরাজদ্দৌল্লা, প্রফুল্ল প্রভৃতি নাটকে রূপায়িত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র বলেছেন, "মহাকবি শেক্‌স্‌পীয়রই আমার আদর্শ, তাঁরই পদাংক অনুসরণ করে চলেছি।" রবীন্দ্রনাথ মালিনী নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, "শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক বরাবর আমাদের কাছে আদর্শ। তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাত প্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে।" রবীন্দ্রনাথও রাজা ও রাণী, বিসর্জন প্রভৃতি নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্রাজেডির আদর্শ অনুসরণ করেছেন। তাঁর রাজা ও রাণী নাটকে চন্দ্রসেন ও রেবতী চরিত্রে ম্যাকবেথ ও লেডি ম্যাকবেথ, কুমারসেন ও ইলার চরিত্রে রোমিও ও জুলিয়েট, বিসর্জন নাটকের জয়সিংহ চরিত্রে এবং মালিনী নাটকের সুপ্রিয় চরিত্রে হ্যামলেটের ছায়া পড়েছে। শেক্‌স্‌পীয়রীয় নাটকের বঙ্গানুবাদ, অনূদিত নাটকের অভিনয়, এবং বাঙ্গালা নাটকে সুদীর্ঘকালব্যাপী শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকের প্রভাব বাঙ্গালীর শেক্‌স্‌পীয়র রসিকতার প্রমাণ।

বাঙ্গালী মনীষা শেক্‌স্‌পীয়রের সৃষ্টির রসে আকণ্ঠ নিমগ্ন হয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর রচনাবলীর বিচার বিশ্লেষণ করেছে। শেক্‌স্‌পীয়রভক্ত যশস্বী অধ্যাপক স্বর্গত তারকনাথ সেনের Hamlet's Treatment of Ophelia in the Nunnery Scene. পি. কে. গুহ রচিত Tragic Relief, শেক্‌স্‌পীয়র-রসিক অধ্যাপক ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত Shakspearian Comedy, Shakespeare's Historical plays, Aspects of

Shakespeares' Tragedies, Shakespeare Manual, The Whirligig of Time ; ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের Marxist Criticism of Shakespeare ; এস. সি. চক্রবর্তীর Shakespeare's Tragi-comedies, Shakespeare's Detractors ; অমলেন্দু বসুর Essays on Shakespeare, প্রিয়রঞ্জন সেনের Romantic Criticism of Shakespeare ; প্রবোধচন্দ্র ঘোষের Tagore as a Critic of Shakespeare প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থ বাঙ্গালীর শেক্‌স্‌পীয়র চর্চার ব্যাপকতা প্রমাণিত করে। বাঙ্গালা ভাষাতেও শেক্‌স্‌পীয়র সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্তের শেক্‌স্‌পীয়র (১৩৮১), উৎপল দত্তের 'শেক্‌স্‌পীয়রের চেতনা', বীণা ঘোষের শেক্‌স্‌পীয়র অনুবাদ ও অনুবাদ সমস্যা (১৩৮২), সনৎকুমার মিত্রের শেক্‌স্‌পীয়র চতুর্থ জন্ম শতাব্দী স্মারক গ্রন্থ (১৯৬৪) প্রভৃতি গ্রন্থাবলী শেক্‌স্‌পীয়ারপ্রেমিক বাঙ্গালী মনীষার দান।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় লেখক ছিলেন শেক্‌স্‌পীয়র। তিনি শেক্‌স্‌পীয়রের রসে নিমগ্ন থাকতেন। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে তিনি কমেডি অফ্ এররস্, কিং লীয়র, রোমিও জুলিয়েট, ম্যাক্‌বেথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি উপন্যাসে শেক্‌স্‌পীয়রীয় ট্রাজেডিকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছেন। কপালকুণ্ডলা চরিত্রে মিরাণ্ডার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলার সঙ্গে মীরান্দা ও দেসদিমনার তুলনা করে বাঙ্গালা সাহিত্যে তুসনামূলক সমালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। তিনটি চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করে তিবি সিদ্ধান্ত করেছেন : "শকুন্তলা অর্ধেক মীরান্দা অর্ধেক দেসদিমনা।" বঙ্কিমচন্দ্রের পর শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত নাটকের তুলনামূলক আলোচনা একটি প্রিয় বিষয় হয়ে ওঠে। 'প্রাচীন সাহিত্যে' শকুন্তলা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার সঙ্গে টেম্পেস্টে মীরান্দার তুলনামূলক আলোচনা করে' আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি ও শেক্‌স্‌পীয়র প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কালিদাস ও ভবভূতি প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের এই দুই কবি ও নাট্যকারের তুলনামূলক সমালোচনা করতে গিয়ে শেক্‌স্‌পীয়রের বিভিন্ন নাটকের সঙ্গেও তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন ; হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কালিদাস ও শেক্‌স্‌পীয়র, হীরেন্দ্রনাথ দত্তের কালিদাস ও শেক্‌স্‌পীয়র, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের বাংলা নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব, নলিনীকান্ত গুপ্তের শেক্‌স্‌পীয়রিয়ানা ও শেক্‌স্‌পীয়র জয়ন্তী, সমালোচক নীরেন্দ্রনাথ রায়ের বঙ্গোলীর শেক্‌স্‌পীয়র প্রেম,

সাম্প্রতিক বিচারে শেক্‌স্‌পীয়র ও ম্যাকবেথের ভূমিকা ; অজিতকুমার ঘোষের বঙ্গরঙ্গমঞ্চে শেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি প্রবন্ধ বাঙ্গালীর শেক্‌স্‌পীয়র রসাস্বাদনের ফল। ঋষি দাস শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনী (১৩৫৭) রচনা করেও শেক্‌স্‌পীয়র চর্চার পথ সুগম করেছেন।

শ্রীঅরবিন্দের মত কবিমনীষীও শেক্‌স্‌পীয়র-চর্চা থেকে বিরত থাকেননি। The Future of Poetry গ্রন্থে শেক্‌স্‌পীয়রের অমর সৃষ্টির মূল্যায়ন করেছেন তিনি। উক্ত গ্রন্থের একস্থানে তিনি লিখেছেন, Shakespeare stands out alone, both in his own age when so many were drawn to the form and circumstances were favourable to this kind of genius, and in all English literature, as the one great and genuine dramatic poet, but this one is indeed equal to a host. He stands out too as quite unique in his spirit, method and quality." (পৃঃ ৯৮)। অপর এক জায়গায় তিনি মন্তব্য করেছেন, "He is not primariiy an artist, a poetical thinker or anything else of the kind, but a great vital creator and intensely, though within marked limits, a seer of life." (পৃঃ ৯৯)।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে শেক্‌স্‌পীয়রের মৃত্যুর তৃতীয় শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত Book of Homage to Shakespeare গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ একটি বাঙ্গালা সনেট লিখে তার ইংরাজী তর্জমা করে দিয়েছিলেন। কবি অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে শেকসপীয়রের সনেট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। নলিনীকান্ত গুপ্তের "শেক্‌স্‌পীয়রের দুটি সনেট" এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তকৃত সনেটের অনুবাদও উল্লেখযোগ্য। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক স্বর্গত সত্যনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শেক্‌স্‌পীয়রের সকল সনেটেরই পদ্যানুবাদ করেছিলেন। কয়েকটি মাত্র পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্র ও কাব্য প্রবন্ধে এবং ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ফোয়ারা গ্রন্থের অন্তর্গত 'ইংরাজী ভাষা ও প্রবন্ধ'-এ শেক্‌স্‌পীয়র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও আলোচনাচক্রের মাধ্যমে বাঙ্গালী শেক্‌স্‌পীয়রকে মনোমন্দিরে পূজা করেছে। কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় শেক্‌স্‌পীয়র পরিষদে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, উৎপল দত্ত, সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়,

গোপাল হালদার, লীলা মজুমদার, পি. কে. গুহ, ড. এম. এম. ভট্টাচার্য প্রভৃতি সাহিত্যিক অধ্যাপক অভিনেতারা সংযুক্ত ছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়র-পাঠ, টীকা-টিপ্পনী সহ রচনাবলী প্রকাশ, অনুবাদ ও অভিনয় ছিল পরিষদের লক্ষ্য। প্রেসিডেন্সি কলেজকে কেন্দ্র করেও শেক্‌স্‌পীয়র চর্চা ঘনীভূত হয়েছিল। এইচ. এম. পার্সিভ্যাল, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ যশস্বী অধ্যাপকবৃন্দ শেক্‌স্‌পীয়র অধ্যাপনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। পার্সিভ্যাল Tempest ও Macbeth সম্পাদনা করেছিলেন। তিনি Tempest এর ভূমিকায় লিখেছেন, "And as I once lectured on Shakespeare in the Classroom, their affection enables me now to lecture again on Shakespeare through the Press."

পার্সিভ্যাল যেমন শেক্‌স্‌পীয়র অধ্যাপনার জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন, তেমনি স্মরণীয় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। অধ্যাপক ঘোষ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আশ্চর্য পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতার সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়র অধ্যাপনা করে রিচার্ডসনের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। অধ্যাপক পি. কে. গুহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কলিকাতা রিপন কলেজে শেক্‌স্‌পীয়র চর্চার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন। কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক জে. এল. ব্যানার্জিও শেক্‌স্‌পীয়র অধ্যাপনার জন্য খ্যাতিমান হয়েছিলেন। তিনি হেন্‌রি দি ফোর্থ, জুলিয়াস সিজার, ওথেলো প্রভৃতি নাটকের সম্পাদনা করেছিলেন। সেক্‌স্‌পীয়রের রসে তিনি এমনই আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন যে সেক্‌স্‌পীয়রের মতই দাড়ি গোঁফ রেখেছিলেন।

বাঙ্গালার নবনাট্য শেক্‌স্‌পীয়রকে নিবিড়ভাবে বরণ করে নেওয়ায় 'বঙ্গীয় শেক্‌স্‌পীয়র পরিষদ', ঐকতান, থিয়েটার ইউনিট, শৌভনিক, বহুব্রীহি প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী আধুনিক প্রয়োগরীতি সহ সার্থকভাবে শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অভিনয় করেছেন। বিজন থিয়েটারের 'দি টেমিং অফ দি শ্রু'র অনুবাদ 'শ্রীমতি ভয়ংকরী'র অভিনয় সাম্প্রতিক কালেও শেক্‌স্‌পীয়রকে জীবন্ত করে রেখেছে। এইভাবে প্রায় দুশ' বছর ধরে শেক্‌স্‌পীয়রের কালজয়ী সৃষ্টি বাঙ্গালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে বাঙ্গালীর মনের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্‌স্‌পীয়রের প্রশস্তি করে লিখেছিলেন, "ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি।" শেক্‌স্‌পীয়র জগতের হতে পারেন, কিন্তু তিনি বাঙ্গালীরও অতি প্রিয়জন।

—•—

CENTRAL LIBRARY

দ্বৈরথ

জয়কৃষ্ণ কয়াল

ভোরের ঘোর তখনও ভালো করে কাটেনি। শমিতা ধড়মড়িয়ে উঠেই চাপা গলায় ডাকাডাকি শুরু করলো—বাপ্পা, এ্যাই বাপ্পা! ওঠ, ওঠ না রে! এ্যাই ব্যাপ্পা, এ্যাই খেঁচুড়ে ছেলেটা··· ।

নভেম্বরের ভোর। ঠাণ্ডা আছে। বেচারা বাপ্পা বার কয়েক উঁ আঁ করে আবার যেমন-কে তেমন। শমিতা আরও ক'বার ডাকলো, ধাক্কা দিল, তারপর একটু অপেক্ষা করে দেখে' শেষটায় এক হেঁচকায় টেনে তুলে বসালো তাকে। দাঁতে দাঁত চেপে ধমক দিল—বোস, বোস হারামজাদা ছেলে···না, কাঁদবি না, মোটে কান্নাকাটি করবি না বলছি···ও কিরে! আবার শুচ্ছিস তুই? এ্যাই বাপ্পা, এ্যাই—বোস এখানে। চোখে জল দিয়ে দিচ্ছি দাঁড়া··· ।

বলেই সে জল নিতে নামতেই বাপ্পা আবার লুটিয়ে পড়লো বিছানায়। শমিতা জল নিয়ে ফিরে সেই দৃশ্য দেখে হতাশা আর বিরক্তিতে ক্ষেপে গেলো একেবারে—হায় ভগবান! আবার শুয়েছিস তুই? দাঁড়া, শোয়াচ্ছি তোর—। বলেই সে হাত বোঝাই করে জল নিয়ে ছুঁড়ে মারলো বাপ্পার দিকে। চোখ মুখ ভিজে, জামায় জলের ঠাণ্ডা ছ্যাঁকা পেয়ে এবার কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসলো বাপ্পা। শমিতা গলা খাটো করে শাসালো—আবার কাঁদছিস তুই! মুখ বন্ধ কর, মুখ বন্ধ কর বলছি···ঘুম, খালি ঘুম তোমার! ঘুম তো নয়, যেন জ্যান্ত মরণ! হতচ্ছাড়া বাঁদর কোথাকার···

শমিতা জলটা ছুড়েছিল বাপ্পাকে। কিন্তু তার কয়েকটা ফোঁটা ছিটকে এসে আমারও গায়ে পড়লো। বিরক্ত হয়ে উঠে বসি আমি! শমিতাকে বলি—এসব কি আরম্ভ করলে মাঝরাতে? ছেলেটার জামাটামাগুলো ভিজিয়ে···কেন, ওকে এক্ষুনি তুলছো কেন?

ও পড়তে বসবে—কাটা জবাব শমিতার। তারপর মুখ ভেংচে হিসহিসিয়ে উঠলো—মাঝরাত! মাঝরাত তোমাদের মতো কুঁড়ের বাদশাদের কাছে, বুঝেছো? ভাখো—ওই ওদিকে চেয়ে ভাখো একবার—দেখতে পাচ্ছো?

জানালা দিয়ে আমাদের সামনের বাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করে দেখালো শমিতা। জিগ্যেস করলো—ঘুলঘুলিটার দিকে চোখ যাচ্ছে? কি দেখছো? কিছু বুঝতে পারো?

দরজা জানালা এঁটে সারা বাড়িটা ঘুমাচ্ছে আর ঘুলঘুলি দিয়ে এক ঝলক আলো এসে বাইরে পড়ছে। ভিতরে বাল্ব জ্বলছে কোন কারণে। কিন্তু এতে কি দেখার বা কি বোঝার থাকতে পারে ভেবে পাই না। বিরক্ত হয়ে শমিতার দিকে তাকাই। ও বুঝিয়ে দেয়—মেয়েকে পড়াচ্ছেন। চুপিচুপি—দরজা জানালা সব বন্ধ করে—যাতে তোমরা কেউ জানতে না পারো। এদিকে সকাল হলে গলা লম্বা করে সকলকে শোনাবে—মিঠুকে আমরা মোটে পড়তে বলি না···কি হবে এই বয়সে এত চাপ দিয়ে···নিজে একটু আধটু যা পড়ে তাই যথেষ্ট।···মাগী কম জাঁহাবাজ ভেবেছো!

বলতে বলতে সে বই খুলে এগিয়ে দেয় বাপ্পার দিকে—নে, পড়! নামতাটা আগে একবার পড়ে নে দশ পর্যন্ত···।

মাঝখানে উঠোন-কাম-কলতলা বাবদ একটুখানি চৌকো জায়গা ওপারে একঘর ভাড়াটে আর এপারে আমরা। ভদ্রলোক কোন কারখানায় মজুরের কাজ করেন। সাদাসিধে গোবেচারা মানুষ। কিন্তু ভদ্রমহিলা একটা ইস্কুলের মাস্টারনী, বড্ড দেমাকী। টেঁচিয়ে কথা বলেন সব সময়। এদিকে শমিতার স্বামীও ভালো চাকরি করে—অন্ততঃ সে তাই মনে করে। সুতরাং তারও গুমোর না থাকার কথা নয়। ফলে দু'জনের মোটেই বনে না। মাসে একবার তুলকালাম ঝগড়া হয়ে গেছে। সেই থেকে দু'বাড়ির বাক্যালাপ বন্ধ। কিন্তু, দু'পক্ষের রেষারেষি আর ঠাণ্ডা লড়াই চলছে সর্বক্ষণ, পায়ে পায়ে। ইদানীং সেটা আরও জমে উঠেছে ও বাড়ির মেয়ে মিঠু আর এবাড়ির ছেলে বাপ্পাকে নিয়ে।

মিঠু এবং বাপ্পা দু'জনেই সমবয়সী। সবে ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে এ বছর। বাপ্পা পড়ে সাধারণ বাংলা ইস্কুলে। মিঠু ইংলিশ মিডিয়ামে। মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর জন্যে মিঠুর মায়ের সর্বক্ষণ নাকউঁচু ভাব। বাংলা পড়া বা সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পারতপক্ষে মিশতে দেন না মেয়েকে। বাপ্পার সঙ্গে তো আরও নয়। কিন্তু বাপ্পার একটা ছবিওয়ালা মজার ছড়ার বই আছে। সেটার প্রতি মিঠুর আকর্ষণ প্রবল। বাপ্পা যখনই সেটা নিয়ে পড়তে বসে তখনই সে জুলজুলে চোখে তাকায়। সম্ভব হ'লে যেন বইটা হাতে নিয়ে দেখে। কিন্তু মায়ের শাসনের ভয়ে পারে না।

একদিনের ঘটনা :

বাপ্পা পড়ছিল আর মিঠু তার পাশে বসে ছবি দেখছিল বইটার। তা দেখেই মিঠুর মা হাঁক দিলেন—মিঠু! কি করছো ওখানে? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ। উঠে এসো এদিকে। ফুইক্।

কাঁদো কাঁদো মুখ করে উঠে গেলো মিঠু। তার মা চোখ পাকিয়ে জিগ্যেস করলেন—কি হচ্ছিল ওখানে?

: ছবি দেখছিলাম। আমাকে ওই রকম একটা ছবির বই কিনে দেও না মাম্মি!

: বাংলা বই! বলতে লজ্জা করলো না তোমার? বাংলা বই কি হবে তোমার? বড়ো হয়ে অরডিনারী মেয়েদের মতো তুমি বুঝি বাসন মেজে আর ঘর মুছে খেতে চাও?

এমনিতে কথাগুলো তেমন কিছু নয়। কিন্তু এর প্রত্যেকটির পিছনেই আবার প্রচ্ছন্ন আছে কিছু কাঁটা, যাকে বেঁধার তাকেই বেঁধে। সে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে। প্রত্যুত্তর দেওয়ার উপায় খোঁজে। নজরে পড়ে বাপ্পা পড়তে পড়তে হঠাৎ খেলনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর যায় কোথায়! সে এসেই একটা চাঁটি বসিয়ে দেয় বাপ্পার মাথায়। তারপর ছেলেকে শাসনের নামে গলা উঁচিয়ে ওপক্ষকে শুনিয়ে দেয়—হতচ্ছাড়া বাঁদর কোথাকার! পড়তে বসলেই তোমার যত খেলার কথা মনে পড়ে! খাবে কি করে? বড়ো হয়ে কি কারখানায় হাতুড়ী পিটতে যাবে?

ঘর মোছা বা বাসন মাজার কথা বলে মিঠুর মা ইঙ্গিত করেছিলেন বাপ্পার মাকে। এবার বাপ্পার মা সরাসরি ইঙ্গিত করলো মিঠুর বাবাকে। ভদ্রলোক তখন ও বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মরা মাছের মতো চোখ করে শুনলেন কথাগুলো। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই আমি মুখ নামিয়ে ঘরে এসে ঢুকি। কাকে কি বলবো বুঝতে পারি না। এমনি ধারা চলছে তো প্রায় প্রতিদিনই। ভীষণ লজ্জা করে আমার। কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে শমিতাকে কিছু বলতে গেলেই সে কোঁস করে ওঠে—তুমি থামো তো! লজ্জা শুধু তোমার একার! কেন, ওদের লজ্জা থাকতে নেই? জানো, সেদিন কি হয়েছিল?

আর একদিনের কথা শুনিয়ে দেয় শমিতা :

বাপ্পা শমিতার মায়ের খুব ন্যাওটা। শনিবার বিকেল হ'লেই শমিতার মা চলে আসেন ওকে দেখতে, আর বাপ্পা তাঁর সঙ্গে চলে যায় মামার বাড়ি।

বলতে গেলে বাপ্পার প্রতিটা শনি আর রবিবার প্রায় কাটে মামার বাড়িতে। ওর মামাদের অবস্থা খুব ভাল নয়। তাছাড়া বাপ্পারও কথায় কথায় হাজার বায়নাক্কা। সব দিক বিবেচনা করে তাই কিছু করে টাকা দেওয়া হয় বাপ্পার দিদিমার হাতে। সে কথাটা কোনো রকমে জানতে পেরেছিলেন মিঠুর মা। হয়তো গোড়ায় যখন কথা বলাবলি বন্ধ হয়নি তখন শমিতাই শুনিয়ে থাকবে তাঁকে। সেদিন যখন বাপ্পা ওর দিদিমার সঙ্গে মামার বাড়ি যাচ্ছিল তখন নাকি মিঠুও বায়না ধরেছিল তার মায়ের কাছে : মাম্মি, আমিও মামার বাড়ি যাবো!

: কার সংগে যাবে?

: দিদা আমাকে নিতে আসে না কেন? বাপ্পার দিদা তো ওকে নিতে আসে।

: তোমার দিদাকে তো আর তোমার বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে রেশান তুলতে হয় না। না হ'লে ছুটে আসতো ফি শনিবার?

বাপ্পার দিদিমা নাকি স্বকর্ণে শুনে গেছেন এই ভাষা। শমিতার ভাষায়—তাঁকে শোনানোর জন্যেই কথাগুলো বলা হয়েছিল ওই ভাবে। তখন তো মিঠুর ড্যাডি বসেছিলেন সেখানে। শুনেছিলেন সব। তাঁর বুঝি লজ্জা করে নি! কই, তিনি কিছু বলেছিলেন তাঁর দিদিমণি ম্যাডামকে?

সুতরাং আমারও যেন আর কিছু বলার থাকতে পারে না।

ইদানীং লক্ষ্য করছি মায়েদের এই রেষারেষির ভাবটা দু'বাড়ির বাচ্চারাও যেন আঁচ করতে পারছে কিছুটা। পাশাপাশি বাচ্চারা থাকলে এমনিতে তারা পরস্পর মেলামেশা করে, খেলাধূলো করতে চায়। কিন্তু বাপ্পা আর মিঠু যেন একে অন্যকে এড়িয়ে চলে যতটা সম্ভব। কি করে' ওরা যেন বুঝে গেছে যে, ওদের মায়েদের মধ্যে একটা অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলেছে এবং ওরা যে-যার মায়েদের কাছে সেই প্রতিযোগিতার একটা উপকরণ বিশেষ। সেই অনুযায়ী ওদের কখন কি করতে হবে ওরা টের পায়। ওরা প্রাণপণে তাই করে কিংবা করতে চায়। যেমন এই আজ :

কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে বাপ্পা প্রথমে কতক গাঁইগুঁই করছিল। শমিতা বই খুলে তার সামনে এগিয়ে দিল। ধমক লাগালো। শেষে দু'টো লজেন্সের টোপও দিল। কিন্তু কোনো কিছুতেই সে পড়া শুরু করাতে পারে নি বাপ্পাকে। তখন শমিতা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে শুনিয়ে দিল—তুই তো পড়ছিস না বাপ্পা! আর মিঠু কত আগে থেকে উঠে পড়ছে জানিস?

সংগে সংগে ঘুমের ঘোর কেটে গেলো বাপ্পার। চমকে প্রতিবাদ জানালো ইঃ, মিছে কথা।

: ওই দেখ্—ঘুলঘুলি দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। তোকে জানতে দেবে না বলে শব্দ করছেনা। ভিতরে বসে চুপিচুপি পড়ছে।

বাপ্পাকে কোলে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে ও বাড়ির ঘুলঘুলির আলোটা দেখিয়ে দিল শমিতা। তাতে যেন মন্ত্রের মতো কাজ হ'লো। কোল থেকে নেমে বাপ্পা নিজে থেকে বই টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল—এক এককে এক……।

একশ' পর্যন্ত নামতা বাপ্পার প্রায় দু'বার পড়া হয়ে যায়, এমন সময় ধড়াস করে দরজা খুলে গেলো ওপারের বাড়িতে। মিঠুর মা বাইরে এসে প্রথমেই বোধহয় লক্ষ্য করলেন এ বাড়িতে আলো জ্বলছে। তারপর হয়তো কান পেতে শুনতে পেলেন বাপ্পার পড়ার শব্দ। সংগে সংগে তীর বেগে ফিরে গেলেন ঘরে। ডাক হাঁক শুরু করলেন। শোনা গেলো মিঠুর বাবাকেই ঝাল ঝাড়লেন তিনি—তুমি কি মানুষ না পশু! আমার না হয় ঘরে বাইরে হাড়ভাঙা খাটুনি। শুলে আর সেন্স থাকে না। তাই বলে তুমিও…। কাল রাত্তিরে লোড শেডিং, বাল্বটা অফ করা হয় নি। কখন কারেণ্ট এসেছে কে জানে! হয়তো সারারাত আলোটা জ্বলে গেলো। তবুও তোমরা একবার ঘুম ভাঙলো না। স্ট্রেঞ্জ!

বন্ধ ঘরে আলো জ্বলার রহস্যটা বোঝা গেলো এতক্ষণে। শমিতাও কথা গুলো শুনলো খুব মন দিয়ে। তার মুখ দেখে মনে হলো সে খুব খুশী। সেই খুশীর আবেশে গলাটা গুলিয়ে সে গেয়ে উঠলো, কই গো, এবার ওঠো না! আমি বাপু ইস্কুলের মাস্টারনীদের মতো হাসব্যাণ্ডদের অতো ধমক দিতে পারি না। তাই বলে তুমি দুপুর পর্যন্ত গড়াবে নাকি?

কথাগুলো বলা হ'লো আমাকে। কিন্তু ঈশ্বর জানেন এর একমাত্র উদ্দেশ্যে ও পক্ষকে শোনানো; চিমটি কাটা কিংবা একটু খুঁচিয়ে দেওয়া। এমন কি কথার মাঝখানে ইদানীং শমিতার এই ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ—এটাও ওপক্ষের শ্লেষাত্মক অনুকরণ, ধ্বনিটিরে ব্যঙ্গ-করা প্রতিধ্বনি বিশেষ। উদ্দেশ্য একটাই। এখানে তা সার্থকও হলো। মিঠুর বাবা ঘুম ভেঙে সবে এসে বাইরে বসেছিলেন গম্ভীর ভাবে। শমিতার কথাগুলো শুনে তিনি ঘৃণার চোখে তাকালো মিঠুর মায়ের দিকে। মিঠুর মাও বোধহয় এটাই চাইছিলেন। সংগে সংগে গেয়ে উঠলেন—ও রকম করে তাকাচ্ছো কেন আমার দিকে? ছাখো, লোয়ার

ক্লাসের মেয়েদের মতো স্বামীদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম ভাঙাতে আমি পারি না। আমার মা খুড়ীরা ওসব আমায় শেখায় নি। যাও, উঠে যাও। মুখ হাত ধুয়ে মেয়েটা একটু পড়তে চায় তো নিয়ে বসাও। আমার তো আর শুধু ঘরকন্না করা নয়! আমার চাকরি আছে। রাত জেগে ঘরে দরজা দিয়ে আমি তো আর পড়াতে বসতে পারবো না।

বাচ্চাদের পড়াশোনা নিয়ে দু'বাড়ির মায়েদের এই লুকোচুরিটা শুরু হয়েছে হালে। এর ধরণটাও বড়ো বিচিত্র। দু'বাড়ির মায়েরাই প্রকাশ্যে দেখাতে এবং শোনাতে চায় যে তাদের ছেলে বা মেয়ে তেমন কিছু পড়াশোনা করে না। অথচ প্রত্যেকেই আবার আশা করে যে তার ছেলে বা মেয়ে এক্কেবারে তাক্ লাগানো রেজাল্ট করবে। এবং শুধু আশা করাই নয়, মিঠু বাপ্পা—দু'জনের জননীই এব্যাপারে মরীয়া। বাধ্য হয়ে দু'পক্ষকেই নিতে হয়েছে গোপন প্রস্তুতির প্রচেষ্টা। এক পক্ষ জানতে পারবে না, বুঝতে পারবে না—অন্য পক্ষ তার ছেলে বা মেয়েকে কিছুটা তালিম দিয়ে নেবে—দু'পক্ষেরই এখন এই ধান্দা। ঘটনার সূত্রপাত হয়েছিল কিছুটা এই ভাবে :

হাফ-ইয়ার্লী পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। বাপ্পা একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে মহা উৎসাহে জানালো যে সে অংকে পঞ্চাশের মধ্যে উনপঞ্চাশ পেয়েছে। এবং একথা সে শুধু মুখেই জানাল না। অভিভাবকের সই করানোর জন্যে ইস্কুল থেকে খাতাটা তার সংগে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই খাতাটা সে একে একে সবাইকে দেখিয়ে তবে ছাড়লো। পাশাপাশি বাড়ির সবাই, এমনকি পাড়ার অনেকেও জেনে গেলো যে বাপ্পা একটি অসাধারণ ভালো ছেলে। কিন্তু এই জানাজানিটা আবার বিশেষ মনঃপুতঃ হ'লো না মিঠুর মায়ের। আর সেটা তিনি আবার প্রকাশ করলেন একটা ছোটখাটো সভাস্থলে।

সেদিন মিঠুর মায়ের এক বান্ধবী এসেছিলেন তাঁদের বাড়িতে। সেই সংগে আরও ক'জন প্রতিবেশিনীর উপস্থিতিতে সেদিন মধ্যাহ্ন আসরটি বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল মিঠুদের বাড়িতে। একথা সেকথার পর সেই আসরে যথারীতি এক সময় উঠে পড়লো ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার প্রসংগ। বান্ধবীটি জানালেন যে তাঁর ছেলেটি এবছর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হয়েছে এবং হাফ-ইয়ার্লীতে সে নাকি ক্লাশে প্রথম হয়েছে। শুনেই মিঠুর মা তাঁকে প্রশ্ন করলেন : তা খবরটা তুমি পাড়ার সবাইকে জানিয়েছো?

: কেন, এর আবার জানানোর কি আছে?

: সে কি গো! তোমার তো খবরের কাগজে পাবলিশ করে দেওয়া উচিত ছিল। জানো, আমাদের এখানে থার্ড গ্রেডের কোনো ইস্কুলে কেউ একটু ভাল নম্বর পেলেই সেটা তার মায়েরা সারা পাড়ায় ঢোল পিটিয়ে দেন।

: তাই নাকি! মায়েরা নিজেরাই?

: না, নিজেরা কি আর বলেন? ছেলেকে শিখিয়ে দেন—যা, অমুককে গিয়ে বলে আয়, তমুককে খাতাটা দেখিয়ে আয় কিংবা কথাটি শুনিয়ে আয়…

শমিতা তখন এ বাড়ির বারান্দায় বসে। মিঠুর মা নাকি চোখ ঠেরে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তাকে। তাতে ও বাড়ির সবাই হেসে উঠেছিল আসর কাঁপিয়ে, মিঠুর মা মন্তব্য করেছিলেন—এসব ভালগারিটি টলারেট করা যায়? বলো তো? …এদিকে হয়তো সারা দিনরাত বই গুঁজে দিয়ে রেখেছে বাচ্চাদের মুখে। না হ'লে কি হ'তো তার ঠিক নেই।

: বাচ্চাদের পড়াশোনার ব্যাপারে বেশী প্রেসারাইজ করা ঠিক নয়—বান্ধবীটি অভিমত দিয়েছিলেন—তাতে ভালোর চেয়ে মন্দটাই বেশী হয়।

: সে তো জানি। আমি তো তাই মিঠুকে পড়ার কথা প্রায় কিছুই বলি না। যখন মনে হয় নিজে একটু আধটু পড়ে। তাই বলে রেজাল্ট কিন্তু খুব খারাপ করেনি। …বেশী পড়ে কারা? যাদের ব্রেন ডাল্। ওর তো তা নয়; তাই অল্প পড়াতেই হয়ে যায়।

বাপ্পার তুলনায় মিঠু যে পড়াশোনায় খারাপ তা আদৌ নয়; বরং উল্টো। কিন্তু তাই বলে এটাও ঠিক নয় যে তার পড়াশোনার ব্যাপারে ভদ্রমহিলা কিছু বলেন না। যতক্ষণ বাড়িতে থাকি দেখি তিনি সর্বক্ষণ টিক্‌টিক্ করছেন মেয়ের পেছনে। তেল মাখাতে গিয়ে তেলের ইংরাজী জিগ্যেস করছেন, চান করাতে গিয়ে চানের। ভাত খাওয়াতে বসে 'রাইস'-এর বানান শেখাচ্ছেন—'রাইস' থেকে 'রিচ্—'রিচ'-এর অপোসিট মিনিং…ইত্যাদি। সেই তুলনায় বাপ্পা নিজেই কিছুটা ফাঁকিবাজ; তার ওপর ওর শরীরটা সব সময় ভালো থাকে না বলে' ইচ্ছে থাকলেও শমিতা সব সময় পড়াতে বা পড়িয়ে নিতে পারে না। সুতরাং সারা দিন রাত তার মুখে বই গুঁজে রাখার কথায় রাগ করতেই পারে শমিতা। তার ওপর আবার 'ভাল ব্রেণ' ইত্যাদি বলে ছেলেকে হেনস্থা করা! সহ্য হয়নি তার। সেদিন উঠে এসেছিল বারান্দা থেকে। কিন্তু সেই থেকে তক্কে তক্কে আছে—কখন সুযে আসলে সব কথা ফিরিয়ে দেওয়া যায় প্রতিপক্ষকে।

প্রতিপক্ষ কিন্তু কি ভেবে যেন রণ-কৌশল পাল্টে ফেলে হঠাৎ। আগে সকালে উঠেই তিনি এক হাতে দাঁতের ব্রাশ আর এক হাতে বই এগিয়ে দিতেন মেয়ের দিকে। এখন মিঠু ঘুম থেকেই ওঠে বেশ দেরীতে। ভদ্রমহিলা কোনো উচ্চবাচ্য করেন না। ঘুম থেকে উঠেও মিঠু বই নিয়ে বসুক না বসুক ভদ্রমহিলা তেমন খোঁজ-খবর রাখেন না। বরং কোনোদিন মিঠু বেশীক্ষণ বই নিয়ে বসে থাকলেই তিনি উল্টো ধমক দেন: এই বয়সে তোর এত পড়ায় আঠা কেন রে? শরীর খারাপ করবে না! যা, খেলাধূলা কর গিয়ে···।

মিঠু তার পুতুলের ডালা নিয়ে এসে খেলতে বসে বাইরে। তা দেখে বাপ্পারও পড়াশোনা শিকেয় ওঠে। চোখের সামনে একজন বাচ্চা খেলা করলে আর একজনের হাতে বই গুঁজে দিয়ে বড়জোর বসিয়ে রাখা যায় কিন্তু পড়ানো যায় না। মুশকিলে পড়ে যায় শমিতা। বাপ্পাকে কিছু বললেই সে কোঁপায়। ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান জানায়: আমার মা একটুও ভালো নয়। মিঠুর মা ভালো। মিঠুকে কত খেলতে দেয়। তুমি আমাকে খালি পড়তে বলো। আমার শরীর খারাপ করবে। আমি চোখ বুজিয়ে মরে যাবো···।

এরপরে আর বাপ্পাকে খেলতে না দিয়ে উপায় থাকে না।

বাপ্পা খেলে। কিন্তু শমিতার মনটা কেমন খচখচ করে। ব্যাপারটা কি? মিঠু কি পড়াশোনা ছেড়ে দিল একেবারে? কেন? ইস্কুলে তো সে যায়। মাঝেমধ্যে বই নিয়েও বসে। কিন্তু আগের মতো তার মায়ের সেই সর্বক্ষণ লেগে-থাকা ভাবটা যেন আর নেই। বিশেষ করে বাপ্পা পড়তে বসলেই যেন মিঠুর খেলা করাটা ভীষণ জরুরী হয়ে পড়ে তাঁর কাছে। কারণটা কি?

কয়েকদিন লক্ষ্য করে একদিন রহস্যটা উদ্ধার করে ফেলে শমিতা।

মেয়েকে পড়ানোর সময় পরিবর্তন করে ফেলেছেন মিঠুর মা। সকালে বা সারাদিনে যতটা হয় হলো—ভদ্রমহিলা তেমন কোনো গরজ দেখান না; বরং একটু অবহেলা বা অবজ্ঞার ভাব বজায় রেখে চলেন। তাঁর আসল মূর্তি প্রকাশ পায় রাতে—খাওয়ার পরে। ঘরের দরজা-জানালা সমস্ত বন্ধ করে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বসেন তিনি। তাঁর কড়া তত্ত্বাবধানে পাঠ চর্চা চলে গভীর রাত পর্যন্ত—যতক্ষণে না মিঠু ঘুমে একেবারে ঢলে পড়ে বিছানায়। আগে সাধারণতঃ খাওয়ার পরে মিঠুদের বাড়িতে চলতো টি. ভি. বা স্টিরিও। সে কারণে শমিতা প্রথমে নাকি তেমন খেয়াল করেনি। কিন্তু একদিন

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলো। টি. ভি. বা স্টিরিওর কোনো সাড়া নেই; অথচ বন্ধ ঘরে আলো। কেমন সন্দেহ হলো তার। পা টিপে টিপে গিয়ে কোন্ ফাঁকে আড়ি পেতে দেখে এলো ব্যাপারটা। তারপর পরপর আরও কয়েকদিন, অবশেষে স্থির-নিশ্চিত হয় সে। আমাকে জানায়: মাগী কেমন চালটা চেলেছে দেখেছো? বাপ্পা পড়তে বসলেই তখন মেয়েকে পাঠায় খেলনা নিয়ে, যাতে কি-না বাপ্পার পড়াটা মাটি হয়। আর এদিকে রাত জেগে জেগে···তাই তো বলি, মিঠু মোটে পড়ে না কেন? ওদিকে ভিতরে ভিতরে যে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে কি করে জানবো! আচ্ছা, দাঁড়াও—।

আমি শমিতাকে সাবধান করি: তাঁদের মেয়েকে তাঁরা যখন পারছেন পড়াচ্ছেন! এই নিয়ে তুমি যেন আবার ঝগড়া করতে যেয়ো না।

: ঝগড়া করবো কেন? দেখো না কি করি!

শমিতা ঝগড়া করলো না ঠিকই, তবে দেখিয়ে ছাড়লো।

সারাদিন আর বাপ্পার পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো তাড়া থাকে না তার। আগের অভ্যাস মতো সকালে হয়তো বাপ্পা বই খাতা নিয়ে বসে কিছুক্ষণ। তাই বলে খেলতে মন চাইলে এখন আর তার মুখ ভার করার কিংবা কোনো রকম ছলছুতো খোঁজার দরকার হয় না। ইচ্ছে হ'লেই সে উঠে যেতে পারে। শমিতা কিছুই বলে না। তার সন্ধ্যার পড়াশোনাও প্রায় তেমনি, নামমাত্র। তারপর শমিতা তাড়াতাড়ি তার খাওয়ার পাট মিটিয়ে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় বিছানায়। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সকাল সকাল ঘুম পাড়ায়। কিন্তু তার আসল পড়ানো শুরু হয় মাঝরাতের পরে—ভোরের দিকে। তখন আর বাপ্পার কোনো ওজর-আপত্তি মানামানি নেই। মিঠুর মা যেমন লোকচক্ষুর অন্তরালে মেয়েকে পড়ানোর জন্যে খাওয়ার পরের কিছুটা সময় ঠিক করে নিয়েছিলেন, শমিতাও তেমনি বাপ্পার জন্যে বেছে নিয়েছে এই সময়টা।

তাতেও কিন্তু স্বস্তি নেই শমিতার মনে। রাতে খাওয়ার পরে কোনোদিন ও পক্ষের বাড়িতে আলো নিভতে একটু বিলম্ব হ'লে তার ঘুম আসে না। মনে মনে ছটফট করে। সেদিন বাপ্পাকেও টেনে তোলে অনেক রাত থাকতে। আমার কিংবা বাপ্পার নিজের কোনো আপত্তি মানে না। ইদানীং আবার একটা নতুন উপসর্গ যোগ হয়েছে—রেডিও। কোনোদিন সকালে মিঠুর খেলনা নিয়ে বাইরে আসতে বেশী বিলম্ব হ'লে কিংবা খাওয়ার পরে যখন ও বাড়িতে পড়াশোনা শুরু হয়েছে বলে মনে হয় তখন শমিতা

রেডিওটা ফুল-ভলিউমে চালিয়ে দিয়ে নিয়ে বসিয়ে দেয় বাইরের বারান্দায়। শুনতে শুনতে সে উল বোনে কিংবা অন্য কোনো হাতের কাজ করে। আসল উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য। আগে আগে ও পক্ষের মেয়ে সকালে খেলনা নিয়ে বেরিয়ে তার ছেলের পড়া নষ্ট করতো। শমিতা খেলনার চাল দেয় না—রেডিও চালায়। ও পক্ষ কিছু বলতে পারে না। আমার বাড়িতে আমি রেডিও চালাচ্ছি—কার কি বলার থাকতে পারে!

এ পক্ষের এই শেষরাতে উঠে পড়াশোনা করানোটা ওপক্ষ টের পায় কি-না ঠিক বোঝা যায় না। যতদূর মনে হয় টের বোধহয় পায়। তাই বলে' ওপক্ষে কেউ উঠে জেগে বসে থাকেন না—কখন শেষরাতে এ-বাড়িতে আলো জ্বলে ওঠে—তিনিও জোরে চালিয়ে দেবেন স্টিরিও কিংবা টেপ। এইটুকু যা রক্ষে। এ-পক্ষের গোপন প্রস্তুতিটা তাই নির্ঝঞ্ঝাটে চলে।

এই চলাটা কিন্তু কোথায় গিয়ে ঠেকেছিল সেটা বোঝা গেলো আরও ক'টা দিন পরে। ফাইন্যাল পরীক্ষার ঠিক আগে।

বাপ্পা আর মিঠু—যদিও দু'জনের ইস্কুল আলাদা—তবুও পরীক্ষাটা দু'জনের শুরু হয়েছিল একই দিনে। কিন্তু পরীক্ষার আগের দিন থেকে বাপ্পা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লো—সঙ্গে জ্বর। ডাক্তার এলেন। বলা বাহুল্য অত্যধিক স্নায়বিক চাপ আর ঘুমের ব্যাঘাত যে বাপ্পার এই অসুস্থতার কারণ তা তিনি নির্দেশ করতে ভুললেন না। শুনে আমি শমিতার মুখের দিকে তাকাই। শমিতা মুখ নামিয়ে নেয়। তার চোখ দু'টো ফোলা ফোলা। বুঝতে পারি আমার কিছু বলার আগেই সে মরমে মরে গেছে। ডাক্তার যদিও সবকিছু দেখেশুনে ওষুধপত্র দিয়ে অভয় দিয়ে গেলেন তবুও মনটা ভীষণ খারাপ লাগে। সকালে মিঠু যখন পরীক্ষা দিতে বেরিয়ে গেলো তখন জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে বাপ্পা জিগ্যেস করলো—বাবা, আমি পরীক্ষা দিতে যাবো না?

জবাব দিতে গিয়ে আমার গলা ধরে আসে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করি। বাপ্পা আবার বলে—আমার কিন্তু নামতা পুরো মুখস্থ। যোগ বিয়োগ সব পারি। জানো বাবা, ছড়ার বইয়ের সব ক'টা ছড়া আমি মুখস্থ লিখে দিতে পারি। আমাকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে যাবে না বাবা?

শমিতা এসে বাপ্পার মাথার ধারে দাঁড়ায়। দেখতে পাই তারও দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে সে হাওয়া করে বাপ্পার মাথায়। পুরো ব্যাপারটায় আমি বুকের মধ্যে কেমন একটা দম আটকানো কষ্ট অনুভব করি। উঠে বেরিয়ে যাই বাইরের দিকে।

আরও ঘণ্টা খানেক পরে দেখতে পাই মিঠুকে কোলে নিয়ে ঘরে ফিরে আসছেন মিঠুর মা। পিছনে পাড়ার ডাক্তার অজয় বাবু। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই ডাক্তারবাবু হেসে বলেন—আর বলেন কেন, পরীক্ষা দিতে দিতে নাকি খুকী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আসার পথেই উনি ডেকে আনলেন, দেখি—।

মিঠুর মায়ের দিকে ইঙ্গিত করে অজয়বাবু তাঁর পিছনে পিছনে গিয়ে ঢুকলেন মিঠুদের ঘরে। একটু পরে মিঠুর বাবাও দেখলাম হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন কোথা থেকে। তাঁর হাতে মিঠুর ইস্কুলের ব্যাগ, জলের বোতল।

এ কাহিনীর একটুখানি উপসংহার আছে।

মিঠু এবং বাপ্পা—দু'জনের কেউই এবছর ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারে নি। মিঠুদের ইস্কুল খুব কড়া। যথারীতি পরের বছর মিঠুকে ট্রান্সফার নিয়ে এসে ভর্তি হ'তে হয়েছে বাপ্পাদের বাংলা ইস্কুলে। দু'জনে এখন একই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়ে। ভেবেছিলাম এই ঘটনার পরে হয়তো দু'বাড়ির মায়েদের রেষারেষিটা গিয়ে একটা সদ্ভাব গড়ে উঠবে এবং বাপ্পা আর মিঠু পরস্পর মন খুলে মেলামেশা করতে পেরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু তার কিছুই হয় নি। বরং মেয়ের এই পরাজয়ের গ্লানিতে মিঠুর মা আরও বেশী দূরে সরে গেছেন—সরিয়ে নিয়েছেন মেয়েকে। মাঝে মধ্যে মূলোর ঢেকুরের মতো প্রকাশ পায় তাঁর মেয়েকে এক বছর ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর গর্ব। এমনিতরো আরও হাজার খুঁটিনাটি দিয়ে দু'পক্ষের ঠাণ্ডা লড়াইটা দু'পক্ষই বাঁচিয়ে রাখে যথাসাধ্য। সুতরাং দিনগুলো চলছিল সেই আগের মতোই।

মাঝে একবার অফিসের কাজে আমাকে বাইরে যেতে হয়েছিল কয়েকদিন। ফিরে এসে দেখি সেদিন আমাদের বাইরের ঘরে বসে খেলা করছে মিঠু আর বাপ্পা। দেখে অবাক হই। আরও অবাক হই যখন দেখি ভিতরের ঘরে খাটের ওপর বসে পাশাপাশি গল্প করছে শমিতা আর মিঠুর মা। চোখ দু'টো রগড়ে নিতে হয়। আমি ভুল দেখছিনা তো! না, আমার সাড়া পেয়ে মিঠুর মা আর শমিতা দু'জনেই বাইরে এসে দাঁড়ায়। শমিতা এগিয়ে এসে ব্যাগ নেয় আমার হাত থেকে। বাপ্পা এসে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার কোমর। আর মিঠুর মা তখন মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে মিঠুর হাত ধরে লাজুক পায়ে বেরিয়ে যান অন্য দরজা দিয়ে। স্পষ্ট শুনতে পাই যাওয়ার

আগে তিনি শমিতাকে জানান দিয়ে যান—এখন তবে যাচ্ছি গো বাপ্পার মা। আয় রে মিঠু—।

আমি অবাক হয়ে শমিতার দিকে তাকাই। শমিতা হেসে মুখ নীচু করে। বলে—হাত মুখ ধোও, কিছু মুখে দেবে তো! তারপর কিছুটা অপেক্ষাকৃত চাপা গলায় আশ্বাস দেয়—শুনবে 'খন পরে সব। শোনার সময় পালাচ্ছে নাকি!

শুনেছিলাম সব। সেই দিনই। কাহিনী অতি সংক্ষিপ্ত। তা এইরকম:

মিঠুর বাবা আগে একটা কোম্পানীতে ছোটখাটো একজন অফিসারের চাকরি করতেন। কোম্পানীটা স্ট্রাইকে বন্ধ হয়ে গেলে চাকরিটা যায়। তারপর কিছুদিন বেকার। শেষে একটা কারখানায় এই মিস্ত্রী-কাম-ম্যানেজার—যে পরিচয়টা আমরা জানতাম। অর্ধেক দিন কাজ নেই এখানে; তবু কোনো রকমে লেগে থাকা। বেকার নামটা ঘোচানো। কিন্তু গত ক'দিন হ'লো মিঠুর বাবার আগের সেই কোম্পানীটা খুলেছে। মিঠুর বাবাও ফিরে পেয়েছেন তাঁর সেই হারানো চাকরি।

এই পর্যন্ত শুনিয়ে শমিতা চুপ করে। আমি জিগ্যেস করি—বেশ তো, সে না হয় হ'লো। কিন্তু এর সংগে তোমাদের ঝগড়ার সম্পর্ক কি?

—ওসব তোমরা পুরুষ মানুষে বুঝবে না, শমিতা মুখ ঝামটা দেয়—মেয়েরা যত চাকরি করুক না কেন, স্বামীদের একটা মর্যাদা না থাকলে—মিঠুর মা কি বলে জানো? তুমি যখন সুট বুট পরে অফিসে যেতে আর মিঠুর বাবা ঘরে বসে—যাবেন, কি যাবেন না ঠিক নেই—তখন নাকি মিঠুর মা-র খুব কষ্ট হ'তো। নিজেকে খুব ছোটো মনে হতো। বলতে বলতে শমিতার মুখে রোদ খেলে যায়। অনেকদিন আগের সেই নরম চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে তাকায় আমার দিকে। বলে—সত্যিই, চাকরিটা পেয়ে খুব খুশী হয়েছে মিঠুর মা। ভালো হ'লো বাবা—পুরুষদের গর্বেই তো মেয়েদের গর্ব, নাহ'লে শুধু চেঁচিয়ে বড় হওয়া। তার কষ্ট কি কম! এতদিন সেই কষ্ট ভোগ করে আসছিল মেয়েটা···।

শমিতা বলে যায়। আমি শুনি। কিছু বুঝতে পারি, কিছু বুঝতে পারি না। সেই বোঝা না-বোঝার ভেতর দিয়ে কি এক প্রশান্তির উত্তাপ এসে আমার বুকে লাগে। মনটা ভরে যায় তাতে। চুপ করে থাকি।

এপিঠ ওপিঠ

প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত

সেদিন শনিবার সন্ধ্যার আড্ডাটি খুব জমে উঠেছিল। বাইরে শ্রাবণের ঘন কালো আকাশ থেকে অবিরাম বর্ষণ আর ভেতরে গরম গরম চা-নিমকির কল্যাণে আমাদের তুমুল তর্কের তুফান। বিতর্ক শুরু হয়েছিল অমৃতসরে স্বর্ণ-মন্দিরে সৈন্য প্রবেশ নিয়ে। সেখান থেকে ইন্দিরাজীর নীতিবোধ, বিরোধীদের ভূমিকা, পাকিস্থান-খালিস্থান হয়ে শেষ পর্যন্ত আরম্ভ হল হিন্দু-শিখের দাঙ্গার কথা।

ব্যোমকেশ বলল, "হিন্দু আর শিখে দাঙ্গা হবে এটা খুব আশ্চর্য। আমি অনেক বছর পাঞ্জাবে কাটিয়েছি। শিখ আর হিন্দুরা একে অন্যকে ভাল বেসেছে, শ্রদ্ধা করেছে, এটাই চিরকাল দেখেছি। অসংখ্য হিন্দুকে স্বর্ণমন্দিরে প্রার্থনা করতে দেখেছি। শিখরাও আমাদের পূজাপার্বণে ফলমূল পাঠিয়েছে। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, এদের যেমন হিন্দুরা নিজেদেরই অংশ মনে করে, শিখদেরও তাই মনে করে।

বরদা উত্তর দিল, "আশ্চর্য কিছুই নয়। আবহমান কাল থেকে এরকম ধর্মীয় যুদ্ধ চলে এসেছে। একবার ধর্মের জিগীর তুলে সাধারণ লোককে ক্ষেপিয়ে দিতে পারলেই হল, তখন আর মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।"

বিশ্বজিৎ এতক্ষণ এককোণে চুপচাপ বসেছিল। চিরকালই সে একটু বেপরোয়া, মারমুখী। সে বলে উঠল "দেখ, এইসব কিছুর গোড়ায় হচ্ছে যত ধর্মীয় অনুষ্ঠান। কত বছর ধরে এদেশে এরকম দাঙ্গা চলছেই—হিন্দু-মুসলমানে, মুসলমানে-শিখে, সিয়া-সুন্নীতে, এবারে আবার হিন্দু আর শিখে। দিল্লীতে, হায়দারাবাদে, ভিওয়ানীতে, বিহার-শরিফে, কোথাও না কোথাও মার-দাঙ্গা হচ্ছেই। এসব যদি শায়েস্তা করতে চাও তবে সোজা বুল-ডোজার দিয়ে সব মন্দির, মসজিদ, গির্জা সব ভেঙে গুড়িয়ে দাও। ধর্মের দোহাই দিয়ে কেউ কিছু করতে গেলে চাবুক মারার ব্যবস্থা কর, সেটা হবে true secularism in practice."

ব্রতীশংকর কলেজে মাস্টারি করছে বেশ কয়েক বছর হল। সে ধীরে ধীরে বলল ; "তা হয় না, বিশু। মানুষ ত সেই পাথুরে যুগ থেকেই নানা ধর্মের উপর নির্ভর করে এগিয়ে এসেছে। তার ভালও আছে, মন্দও আছে।

কিন্তু সেই চিরকালের বিশ্বাসকে ত তুমি চাবুক দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারবে না। তুমি ত নিজে স্বামীজির পরম ভক্ত। তিনিও কি ধর্মে নির্ভরতার কথা বলেন নি? আসল কথা হল দেশের বেশীর ভাগ লোক অজ্ঞ। লেখাপড়া জানে না, ভালমন্দ বিচার করার শক্তি নেই। যদি শিক্ষার মান বাড়াতে পারো, আরও লোককে শিক্ষিত করে তুলতে পারো, তবে এসব দাঙ্গা আপনা থেকেই কমে যাবে, কারণ,· ...”

ব্রতীশংকর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, বিমান বাধা দিল, “শংকরদা, তোমার কথা মেনে নিতে পারছি না। শিক্ষিতের সংখ্যা আর শিক্ষার মান গত পঞ্চাশ বছরে এদেশে অনেকটা বেড়েছে, কিন্তু তাতে এ জাতের দাঙ্গা-হাঙ্গামা কমে নি বরং অনেকটা বেড়েছে। আর প্রায়ই দেখা যাচ্ছে, যাদের আমরা শিক্ষিত বলে মনে করি, তাদেরই কেউ না কেউ পরামর্শ দিয়ে সাধারণ লোকদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে দাঙ্গা বাঁধায়। তা ছাড়া, শিক্ষার কথা যদি বল, তবে অনেক উন্নত দেশেও এমনি ব্যাপার ঘটছে। আয়রল্যাণ্ডের দিকে, লেবাননের দিকে তাকাও। অন্যদিকে দেখ, অনেক নিরক্ষর উপজাতিরা দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি রয়েছে নিজের নিজের আলাদা বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার নিয়ে, তবু দাঙ্গা বাঁধে নি।’

সবাই যখন এমনি নিজেদের মতামত বলছিল, আমি বিপ্রদাসবাবুকে বললাম, “স্যার, আপনি ত কিছু বলছেন না। এ বিষয়ে আপনার কি মত, বলুন না।”

অধ্যাপনার কর্ম থেকে অবসর নিয়ে বিপত্নীক বিপ্রদাসবাবু ক’বছর হল এই শনিবারের আসরটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনিই এর মধ্যমণি। অমায়িক এবং সস্নেহ ব্যবহারে এই বিদগ্ধ লোকটি আমাদের সবাইকে এমন আপন করে নিয়েছিলেন, যে তাঁর সঙ্গে অসংকোচে সব আলোচনা করতে পারি। এই মিষ্টভাষী সহজ সুন্দর মানুষটিকে আমরা যেমন শ্রদ্ধা করি তেমনি ভালবাসি।

বিপ্রদাসবাবু বললেন, “দেখ বেদুইন, শিক্ষার সঙ্গে এই সব ধর্মীয় দাঙ্গার কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সেটা সঠিক আমি বলতে পারব না। তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দুইটি অভিজ্ঞতার কথা তোমাদের বলতে পারি।”

“বলুন, বলুন”—সবাই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল।

বিপ্রদাসবাবু আস্তে আস্তে শুরু করলেন, “আমার দুটো কাহিনীই স্বাধীনতা পাওয়ার আগের যুগের, অর্থাৎ ইংরেজদের আমলের। তাই তখনকার প্রেক্ষাপট বা পরিস্থিতি সম্বন্ধে আগে তোমাদের কিছু বলে নিতে চাই।

"এই শতকের প্রায় গোড়া থেকেই বাংলাতে স্বাদেশিকতার ভাবনা দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। প্রথমে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, আর তারপরে নন-কো-অপারেশন ছিল প্রেরণা। একথা তোমরা সবাই জান। মুসলমানেরা এসব আন্দোলনে খুব সামান্যই যোগ দিয়েছিল। ইংরেজরা এর সুযোগ নিয়ে divide and rule নীতি কাজে লাগাতে একটুও দেরী করে নি। আন্দোলনের মধ্যেই অতি সহজে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ গড়ে তুলতে বিলম্ব হল না। অথচ আমাদের ছোটবেলাতে দেখেছি হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে গভীর সম্প্রীতি ছিল, একে অন্যের সহায় ছিল, পারস্পরিক সাহায্য ছিল অকুণ্ঠ। কিন্তু দ্বিতীয় দশকেই দেখা গেল—এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ আর হেষারেষির অন্ত নেই। বিবাদ-বিরোধিতা প্রায় সর্বত্রই শুরু হলেও তখনও কোথাও বড় দাঙ্গা বা riot হয় নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল ঢাকা। তার কারণ, তখন ঢাকায় বেশ কিছু বিত্তশালী মুসলমান পরিবার ছিলেন, মুসলমান সমাজের উপর এদের অবাধ প্রতিপত্তি ছিল। নানা রকমের সুযোগ-সুবিধে পেয়ে এরা ইংরেজ শাসকদের খয়ের-খাঁ এবং বশংবদ হয়েছিল। এদের মাধ্যমেই স্বদেশীওয়ালাদের শায়েস্তা করতে ইংরেজরা প্রায়ই ঢাকাতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা লাগিয়ে দিত। ১৯২৬এর পর থেকে স্বাধীনতা পাওয়া পর্যন্ত ফি-বছরেই বার বার ঢাকাতে এই দাঙ্গা চলেছে।

"আর একটা কথা মনে রেখো। তখনকার দিনে আজকালের মতো দুই দলে মুখোমুখি হয়ে ইটপাটকেল, বোমা, বন্দুক, রিভলবার নিয়ে লড়াই হত না। তখন ছিল ছোরা ছুরি দিয়ে অতর্কিতে খুন করে ফেলা। আজ যদি দেখা গেল দুজন মুসলমানকে হিন্দুরা ছোরা মেরেছে, পরদিন বদলা নিতে তিনজন হিন্দুকে কোথাও মেরে ফেলা হল। এরকম চলত কিছুদিন ধরে, মাঝে মাঝে কারফিউ হত। শেষপর্যন্ত একটা শান্তি কমিটি বসত আর সাময়িক একটা মিটমাট হত। তারপর ইংরেজরা আবার কলকাঠি নাড়লেই আবার একদিন দাঙ্গা সুরু হত। ঢাকায় এটা হরদম চলত। আমার দেশ ঢাকা, আমার পুরো ছাত্রজীবনটা ঢাকায় কেটেছে। সুতরাং এর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল।

"এবার আমার কাহিনীটি বলি। ঢাকা থেকে যে সড়কটা পশ্চিমদিকে বেরিয়ে গেছে সেটা ধরে মাইল সাতেক গেলে একটা বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম পাবে। গ্রামের নাম মীরপুর, হিন্দু-মুসলমান দুই-ই আছে ; মুসলমানের সংখ্যা কিছু বেশী হতে পারে। এই গ্রামের একটি পুরানো জীর্ণ বাড়িতে এক গরীব

পরিবারে এক বিধবা মহিলা থাকতেন। তিনি তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে কায়ক্লেশে সংসার চালাতেন। আমি যখন ছোট, স্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ি, তখন এই প্রৌঢ় মহিলাকে দেখেছি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের সহরের বাড়ীতে এসে কিছুদিন থাকতেন; আমাদের বিপুল সংসারের নানা ব্যাপারে আমার মাকে সাহায্য করতেন। তাঁকে আমরা 'পিসিমা' বলে ডাকতুম। ছেলেরাও মাঝে মাঝে পিসিমার সঙ্গে আসত। বড় ছেলে শচীন্দ্র—সবাই ডাকত "রাখাল" বলে। আমরা ডাকতাম "রাখাল-দা"।

"রাখালদা আমার চেয়ে পাঁচ-ছয় বছরের বড় ছিলেন, অতি সুন্দর সুপুরুষ; খুব ভাল ফুটবল খেলতে পারতেন। গ্রামের স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাস করে-ছিলেন। তারপর ঢাকাতে এসে মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল থেকে ডাক্তারি পাশ করেন। আমার বাবার আর্থিক সাহায্যেই তাঁর পড়া সম্ভব হয়েছিল। সেই সূত্রে রাখালদা আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থবল ছিল না, ডাক্তারি পাশ করার পর সহরে চেম্বার করে প্র্যাক্‌টিস করা হল না। তাই নিজের গ্রামেই তিনি ডাক্তারি শুরু করেন। অল্প কয়েক বছরেই ডাক্তার হিসেবে তাঁর যথেষ্ট সুনামও হয়েছিল। রাখালদার ছিল অতি সুন্দর ব্যবহার, ছিল রুগীর প্রতি একটা আন্তরিক দরদ। অনেক সময় দুঃস্থ পরিবারে রুগী দেখতে গিয়ে তাদের দুরবস্থা দেখলে ভিজিটও নিতেন না। রাখালদা নিজে যে খুব গরীব ছিলেন সেকথা তিনি কখনো ভোলেন নি। হিন্দু-মুসলমান সবাই এই অজাতশত্রু ডাক্তারটিকে সত্যিই ভালবাসত। সেই সময় আমি মাঝে মাঝে কলেজের ছুটির দিনে সাইকেল চেপে রাখালদার বাড়ী যেতাম, তখন দেখেছি রাখালদা সেখানে সবারই খুব প্রিয়।

"১৯৪০-এর গোড়ার দিকে ঢাকাতে একটু বড় রকমেরই হিন্দু-মুসলিম হানাহানি আরম্ভ হল। সেবার দাঙ্গাটা সহর ছাড়িয়ে সহরতলীর দিকেও অনেকটা ছড়িয়ে পড়েছিল। আশেপাশে সর্বত্রই একটা থমথমে ভাব, সবাই একটু সন্ত্রস্ত।

"এরকম সময়ে একদিন সন্ধ্যার একটু আগে একজন মুসলমান ভদ্রলোক ডাক্তারের বাড়ী এসে হাঁক দিলেন, 'ও রাখাল ডাক্তার, বাড়ী আছ?'

"ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডাক্তার বলল, "আরে, আখ্‌তার ভাই যে, আস, আস, কি মনে কইর‍্যা?"

"আরে, কও ক্যান্। আমাগো বাড়ীতে তোমার এখন একবার যাইতে হইব। ছোট ভাইটার বিবির বাচ্চা হওনের কথা। কি একটা গোলমাল

পাকাইছে। তুমি একবার না দেখলে ত চলবো না। চল দেখি আমার লগে।"

"এই ত সেদিন গেছিলাম। কই, কেউ ত কিচ্ছু কয় নাই।"

"আরে ডাক্তার, মাইয়ালোকের কারবার। সময় মতন সব কথা কইলে ত হইতই। বিবিরা কি সহজে মুখ খুলবো। যাউক, এখন ত চল।"

"চল—", এই বলে রাখালদা একটা সার্ট গলিয়ে ব্যাগ হাতে আখ্‌তারের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

"এখন আখ্‌তারের পরিচয়টা তোমাদের দিয়ে নি। আখ্‌তারউদ্দীন আহমেদ রাখালদার সহপাঠী ছিল। এক সঙ্গেই ছোটবেলা থেকে গ্রামের স্কুলে পড়েছে, কতদিন দুজনে আরও সব সহপাঠী আর গ্রামের ছেলেদের নিয়ে দূরের বিলে মাছ ধরতে গিয়েছে, একত্রে ফুটবল টীমে খেলেছে। রাখালদার সঙ্গেই আখ্‌তারও ম্যাট্রিক পাশ করে। তারপর সে কলেজে বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল, বিশেষ সুবিধে হয় নি। তখন মোক্তারি পাশ করে ঢাকা কোর্টে মোক্তারি করতে আরম্ভ করে, বেশ দু-পয়সা আয় হয়। তাছাড়া, ওর দেশে যথেষ্ট জমি-জমা, ধানের গোলা, পুকুর, মস্ত বড় পাকা ভিতের বাড়ীও রয়েছে। মীরপুরের মুসলমানদের মধ্যে সে সময় আখ্‌তারউদ্দীন একজন উচ্চশিক্ষিত গণ্যমান্য লোক, প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি যথেষ্ট।

"রাখালদা সেরাত্রে সেই কল থেকে আর বাড়ী ফেরেন নি। অন্ধকার রাতে খোঁজখবর করারও কেউ ছিল না। পরের দিন অনেক বেলাতে দেখা গেল রাখালদার ছিন্নভিন্ন দেহ গ্রামের পাশের খালের কচুরীপানার উপরে ভাসছে। শরীরে আরও দায়ের অনেক আঘাত রয়েছে। থানা-পুলিশ হল, কিছুদিন দারোগা-পুলিশ লোকদেখানো ঘোরাঘুরি করল, তারপর সব কিছু ধামাচাপা পড়ে গেল। বার বার খোঁজ নিতে নিতে অনেকদিন পরে জেনেছিলাম, আখ্‌তারের বাড়ীতে সে সময় কোন আসন্নপ্রসবা ত ছিলই না, কোন রোগীই ছিল না। আখ্‌তারের বাড়ীরই চাকরের ঘরে তাকে আট্‌কিয়ে রেখে অনেক যন্ত্রনা দিয়ে শেষে কেটে ফেলা হয়েছিল। এমনি করে আমার অজাতশত্রু রাখালদার জীবনের সমাপ্তি হল।"

বিপ্রদাসবাবু চুপ করে রইলেন বেশ খানিকক্ষণ। হয়ত তাঁর মনের কোণে সেদিনের সেই করুণ দৃশ্যটি ভেসে উঠেছিল। আমরাও স্তব্ধ, নির্বাক। শুধু বাইরের অবিরাম বর্ষণের ঝরঝর শব্দ ভেসে আসছিল।

বিপ্রদাসবাবু তারপর আবার বলা শুরু করলেন, "এখন আমার দ্বিতীয়

কাহিনীটি শোন। ১৯৪৬-এ জিন্না-সুবারর্দীর direct action—যার ফলে দেশবিভাগ অনিবার্য হল—কলকাতার সেই দাঙ্গার সময়ের ঘটনা। প্রবোধ চক্রবর্তী আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সতীর্থ। কলেজের পড়া শেষ করে প্রবোধ বেশ কিছুদিন ইউ-পি-তে চিনির ফ্যাক্টরীতে চাকুরী করেছিল। সেখানে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা হল না, তাই সে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে এল। অনেক কষ্টে এখানে ফুড-ডিপার্টমেণ্টে একটা ছোটখাটো চাকুরী জোগার করে নিল। সঞ্চয় সামান্য, আয় কম। অনেক খুঁজে পেতে পার্ক-সার্কাসে কম ভাড়ার ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ী ভাড়া করে স্ত্রী কমলা আর তিন বছরের মেয়ে মীরাকে নিয়ে সংসার পাতল। এটা মুসলমান-প্রধান অঞ্চল। ওর দুইপাশের বাড়ীর কাছাকাছি বাসিন্দারা প্রায় সবাই মুসলমান। পাশের বাড়ীটিও দোতলা, সেখানে থাকত কোন এক বড় ফার্মের সিকিউরিটি ফোর্সের এক হাবিলদার—মহম্মদ ইসমাইল।

"ইসমাইলকে আমি দু'একবার দেখেছি, প্রবোধের বাড়ীতে যখন গিয়েছি। হাবিলদার হওয়ার উপযুক্তই বটে। বেশ লম্বা দশাসই চেহারা, মন আড়াই ওজনের বিশাল বপু, ইয়া মোটা একজোড়া কাইজারি গোঁফ। খাকি পোষাক পরে' বগলে ছোট লাঠি নিয়ে সে যখন দাঁড়াত তখন জঙ্গীলাট বলে মনে হত। সকালবেলা অফিস থেকে একটা জীপ এসে তাকে নিয়ে যেত। প্রবোধের কাছে শুনেছিলাম তার বাড়ী উত্তর প্রদেশের বালিয়া অঞ্চলে। লেখাপড়া বোধ হয় সামান্যই জানত, তার চাকুরীতে সেটার বেশী প্রয়োজনও ছিল না। ইসমাইল ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলত। পাশাপাশি বাস, তাই ইসমাইলের সঙ্গে প্রবোধের খানিকটা আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। ঘনিষ্ঠতা তেমন কিছু নয়—কেমন আছেন, কি খবর, আজ বড্ড গরম,—এই পর্যন্ত।

"এর মধ্যে এল ছেচল্লিশের কলকাতার দাঙ্গা। সারা সহর জুড়ে খুনোখুনি, রক্তারক্তি। অসংখ্য নিরীহ মানুষ যেখানে সেখানে ছোরা খেয়ে মরল, কলকাতার পথে ঘাটে কত মড়া পড়ে রইল। যে পাড়ায় যারা সংখ্যালঘু অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে তারা দুয়ার বন্ধ করে রইল। স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে প্রবোধও দরজা জানালা সব এঁটে নিঃশব্দে ভয়ে ভয়ে ভিতরে বসে রইল। জানালার খড়খড়ি দিয়ে দিনের আলোতেই দেখতে পেল উন্মত্ত গুণ্ডার দল কতজনকে রাস্তার উপরেই কুপিয়ে খুন করছে। চোখের সামনে মানুষকে কেটে ফেলতে দেখে কমলা ত প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মতো, প্রবোধও ভবিষ্যতের শঙ্কায় নিস্তব্ধ। এমনি করে দুদিন কাটল। মাঝে মাঝেই চারদিক

থেকে প্রচণ্ড চীৎকার শোনা যাচ্ছে, "আল্লা হো আকবর"। আবার অনেকদূর থেকে ভেসে আসছে, "বন্দেমাতরম্"। উৎকণ্ঠায়, উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায়, ভয়ে, ওরা খেতে পারছে না, ঘুমাতে পারছে না; এক অসহনীয় অবস্থা। হাঙ্গামার তৃতীয় দিনে প্রবোধ ওপর থেকে দেখতে পেল, পাশের বাড়ীর ইসমাইল এসে ওর বাড়ীর দরজায় কড়া নাড়ছে। খুলবে কি খুলবে না খানিকটা ইতস্তত: করে' প্রবোধ দরজাটা খুলল। ইসমাইলের পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, পায়ে চপ্পল। ঘরে ঢুকেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, বাবুজী, কথা আছে। প্রবোধের পিছনে কমলা মেয়ে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ইসমাইলকে ঘরের মধ্যে দেখে ওদের অন্তরাত্মা তখন শুকিয়ে গেছে।

"এরপর ইসমাইল যা বলেছিল সেটা সংক্ষেপে বলি, অবশ্য ইসমাইলের ভাষায় নয়।

"ইসমাইল—বাবুজী কি রকম খুন-খারাপি চলছে, দেখতেই পাচ্ছ! তোমাদের ওপর গুণ্ডাদের নজর আছে। এ-পাড়ায় আর যে ক'জন হিন্দু ছিল সবাই পালিয়ে গেছে, তাদের সবগুলো বাড়ী লুটপাট হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে কাল তোমার বাড়ী চড়াও হবে। এতদিন আমি ঠেকিয়ে রেখেছিলাম, আর বোধহয় পারব না। সব লুট করবে, তোমাদেরও রেহাই দেবে না।

"একথা শুনে কমলা ত কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল, প্রবোধের অবস্থাও করুণ, বুকের ভিতর থেকে কি যেন ঠেলে উঠছে।

"ইসমাইল: বহিনজী, একটু শক্ত হও। আমার কথা শোন, ঘাবড়াও মৎ। আজ রাতে আমাদের দুই বাড়ীর ছাদের মধ্যে কাঠ পেতে দেব; সামান্য ত একটু ফাঁক। তোমরা সেই কাঠের উপর দিয়ে আমার বাড়ীতে চলে আসবে। আমার ওখানে কদিন লুকিয়ে থাকবে, এছাড়া আর কোন উপায় নেই। বাইরের দরজা দিয়ে নিয়ে যেতে পারব না, আমার বাড়ীর বারান্দায় ওরা রয়েছে।

"খানিকটা সাহস দিয়ে ত হাবিলদার চলে গেল। A drowning man catches at a straw—কি করবে, স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ করল ইসমাইলের বাড়ীতেই যাবে। বাইরে বেরুবার ত উপায় নেই।

"সত্যিই সেদিন রাতে ইসমাইল দুটো চওড়া তক্তা পেতে দিল দু'ছাতের মধ্যে। হাত ধরে ওদের পার করে নিয়ে নিজের দোতলার একটা ছোট ঘরে রেখে দিল। ভেতরে ছিল ইসমাইলের স্ত্রী আর ৫/৬ বছরের একটি মেয়ে 'লিলি'।

"বুক ঢিপ ঢিপ করছে, কখন মরতে হবে, কি হবে—ভয়ে চিন্তায় প্রবোধ ইসমাইলের হাত দুটো ধরে বলল, "ভাই, আমাদের যদি মেরে ফেলে, তবে তুমি শুধু আমার মেয়েটাকে বাঁচিয়ে দিও।...

"ইসমাইল : বাবুজী-বহিনজী, কি হবে জানি না, তোমাদের কথা দিচ্ছি, আমার লিলি যদি বেঁচে থাকে তবে মীরাও বাঁচবে।

"একটু যেন আশ্বাস পেল, আপাততঃ আশ্রয় মিলল। এরকম পরিবারে আর এই পরিবেশে শিক্ষা বা রুচির বা সৌন্দর্যের কোন চিহ্ন ছিল না, ওরা সেটা আশাও করে নি। কিন্তু ইসমাইলের স্ত্রী প্রবোধদের জন্য যথেষ্ট যত্ন নিয়েছিল।

"ইসমাইলের কথাই ঠিক। পরদিন বেলা নটায় সময় একদল গুণ্ডা শাবল, কুড়াল, দা, লাঠি নিয়ে এসে প্রবোধের বাড়ীর দরজা মুহূর্তের মধ্যে ভেঙে ফেলল আর লুটপাট শুরু হয়ে গেল। উপরের ঘরের ছোট জানালার খড়খড়ি দিয়ে কমলা আর প্রবোধ সবই দেখল। আশ্চর্য! ইসমাইল নিজেও তার চাকর দু'টিকে নিয়ে এই লুটে যোগ দিয়েছে! মনে হচ্ছিল, সে-ই সর্দার, আর তার নির্দেশেই লুটতরাজ হচ্ছে। লুটের অনেক জিনিষই ইসমাইলের চাকরেরা নিয়ে এল ইসমাইলের বাড়ীর নীচের তলায়। দু'জনেই তখন মনে মনে ভাবছে, এরপরে ওদের দুজনকেই গুণ্ডাদের হাতে তুলে দেবে না ত'?

"সবই দেখল বটে, কিন্তু কমলা বা প্রবোধ এ বিষয়ে ওদের ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে নি। বলার সাহসই হয় নি। এ পর্যন্ত ইসমাইল ওদের আশ্রয় দিয়েছে, বাঁচবার একটু ক্ষীণ আশা রয়েছে তখনও।

"এরপরেও দুই দিন দুই রাত কেটে গেল। ওরা ইসমাইলের বাড়ীতেই লুকিয়ে আছে। ইসমাইলরা রুটি গোস্ত খায়। কিন্তু ওদের জন্য আলাদা বন্দোবস্ত করেছে, মীরার জন্য দুধের বন্দোবস্ত করেছে। সাধ্যমত যত্নের ত্রুটি করে নি। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া তখন ওদের মাথায় উঠে গেছে। কমলা ত কথাই বলতে পারছিল না, নির্জীব হয়ে পড়েছিল। মানুষ খুন করা দেখে সে কিছুই মুখে দিতে পারে নি।

"দু'দিন পরে ইসমাইল এসে বলল : বাবুজী, আর ত তোমাদের এখানে থাকা চলবে না। পাড়ার সবাই বুঝতে পেরেছে, তোমরা আমার এখানেই আছ—এ নিয়ে খুব হাম্‌লা হবে। আমি একটা গাড়ীর বন্দোবস্ত করেছি। আজ শেষরাতে তোমাদের নিয়ে গিয়ে কোনো হিন্দুপাড়ার কাছে ছেড়ে আসব। কোন্ দিকে গেলে সুবিধে হবে বল, বেশী দূরে ত যেতে পারব না।

"কমলার মামা বিমল ভট্টাচার্য থাকতেন বালিগঞ্জের দিকে। কাছেও বটে, হিন্দুপাড়াও বটে—প্রবোধ সেই কথাই বলল।

"তখনও অন্ধকার কাটে নি, সূর্য ওঠার দেরী আছে। একটি জীপগাড়ী এসে হাজির হল। ইসমাইল প্রবোধদের তুলে নিজেই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেল। গড়িয়াহাটের কাছে এসে গাড়ী থামিয়ে বলল, 'আর ত আমি যেতে পারব না, বাবুজী। হিন্দুপাড়ায় ঢুকলে ওরা আমাকে ছাড়বে না। এখানেই তোমাদের নাবিয়ে দেব। তোমরা ট্রামলাইন ধরে চলে যাবে।'

"প্রবোধ কমলা মেয়েকে নিয়ে নেমে এল। ধন্যবাদের কথা বলতে পারল না। ওদের দুজনের চোখ দিয়ে তখন অঝোরে জল পড়ছে। ইসমাইলও নেবেছিল। প্রবোধের কাছে এসে ওর হাতে চারটে একশ' টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলল,—

"এটা নাও। কিছু মনে করো না। আমি জানি তোমার হাতে এখন কিছুই নেই বাবুজী। পরে যখন সময় হবে ফিরিয়ে দিও। বহিনজী, এবার আমি যাই। আমার গরীবখানায় তোমার অনেক তকলিফ্ হয়েছে।....কিন্তু কি আর করা যাবে।"

"গাড়ী চলে গেল। প্রবোধ স্ত্রী-কন্যাকে কোন রকমে টেনে নিয়ে প্রায় আধমাইল দূরে বিমলবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উঠল। প্রবোধের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম প্রবোধরা আর বেঁচে নেই।

এরপর প্রায় দু'মাস কেটে গেছে। সহরের জীবনযাত্রা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, যদিও অনেকের মন থেকেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি মুছে যায় নি। কমলা খানিকটা সুস্থ হবার পর প্রবোধ নতুন করে আবার বাসা করেছে ভবানীপুরের একটা ফ্ল্যাটে। প্রবোধ কাজেও জয়েন করেছে। অফিসে ফোন করে ইসমাইলকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানিয়েছে, তারপর একদিন সেখানে গিয়ে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে এসেছে। ইসমাইলও ওর নতুন বাড়ীর ঠিকানা নিয়েছে, বহিনজী কেমন আছে খোঁজ করেছে।

"এর কদিন পরে দুপুরবেলায় প্রবোধ গেছে অফিসে, কমলা বসে বসে সেলাই করছে, মেয়ে ঘুমোচ্ছে, এমন সময় কে দরজায় এসে কড়া নাড়ল। কমলা দরজা খুলতেই দেখে ইসমাইল। কমলার বুকটা কেঁপে উঠল, মনের ধকল ত তখনও সারে নি। একা বাড়ীতে, ঘরের মধ্যে এই জঙ্গী মুসলমান!

"চেয়ার টেনে বসে সে বলল, বহিনজী এখন ভাল আছ ত? বাবুজী ত এখন অফিসে। আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি। তোমার বাড়ী যখন লুঠ হয়,

আমিও তখন আমার লোক দিয়ে কিছু জিনিষ লুঠ করিয়ে আমার বাড়ীতে এনে রেখেছিলাম। আজ একটা ট্রাক পেয়েছি, তাই ওগুলো তোমাদের ফেরৎ দিতে এসেছি। আমার লোক ওগুলো তুলে দিয়ে যাবে এখন। আমার কাছে যেগুলো ছিল, তার কিছু খোয়া যায় নি, তোমার জিনিষ ঠিক আছে। পরে বাবুজীর সঙ্গে দেখা হলে সব বলব।"

"একটু পরে ইসমাইলের লোকেরা দু'টো বড় ট্রাঙ্ক, মস্ত একটা সুটকেশ, দুটো রাগ, রেডিয়ো সেট, গ্রামোফোন—এসব রেখে গেল। তারপর ইসমাইল হাবিলদার বিদায় নিয়ে গেল। কমলা শুধু অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

"এখানেই আমার কাহিনীর শেষ। প্রবোধ-কমলা এরা এখন উত্তর কলকাতায় থাকে। মীরার বিয়ে হয়ে গেছে। ইসমাইল কোথায় আছে জানি না। দেশবিভাগের পর পাকিস্থানে চলে গেছে কিনা বলতে পারব না।"

রাত অনেক হয়েছে, বৃষ্টিটাও অনেক কমেছে। আসর ভাঙ্গল। অন্ধকার পথে টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টির মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফেরার সময় মানুষের মনের নানা বৈচিত্র্যের কথাই ফিরে ফিরে মনে হচ্ছিল।

বৈষ্ণব ধর্ম ও শ্রীচৈতন্যদেব

দিলীপকুমার দত্ত

শ্রীচৈতন্যদেব শুধুমাত্র বৈষ্ণবধর্মের ইতিহাসেই নয়, ভারতবর্ষের সমগ্র ধর্ম-সাধনার ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় নাম। অধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষে ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ঐতিহ্য সুপ্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠলেও উভয়েরই পরম-স্বরূপের আবিষ্কার একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবেরই রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনায় গভীরতর অবগাহনের ফলেই সম্ভব হয়েছে। বৈদিক মন্ত্রে যে বৈষ্ণব ধর্ম ও আরাধ্য হিসাবে ঐশীসত্তা শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুর প্রথম পদধ্বনি শোনা যায়, (দ্রঃ যথাক্রমে শুক্লযজুঃ/৫ম অধ্যায়/২১, ২২, ২৫ প্রভৃতি মন্ত্র এবং ঋক্‌/১ম অঃ/১৬-২১, ১৫৪-১৫৬, ৬ষ্ঠ/৬৯, ৭ম/৪৪, ৪৯, ৮ম/১৫৪ প্রভৃতি), নানা উত্থান পতন ও বিবর্তনের স্তর পার হয়ে এসে শ্রীচৈতন্যদেবের রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনার মধ্য দিয়েই তাদের পরম পরিণতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে এবং মধুররসের পরমকান্ত "গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর" শ্রীকৃষ্ণে। এই শ্রীকৃষ্ণই সমগ্র

ভারতবর্ষের ধর্মসাধন ক্ষেত্রে ত্রি-দেবতার মধ্যমণি, পরতত্ত্ব, পরমাত্মা, পরমেশ্বর,—বিশ্বজগতের পালক ও নিয়ামক। সুতরাং বলা যেতে পারে—সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মার যে ধর্মসাধনা, আধ্যাত্মিক বোধির পরম জাগরণের কামনা—শ্রীচৈতন্যদেবই সেই পরম জাগরণ। স্বর্গীয় আচার্য্য ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চিরায়ত ভারতবর্ষের ধর্ম ও সাধনার জগতে শ্রীচৈতন্যদেবের এই সহজ স্বাভাবিক রূপটিকে চিহ্নিত করে গেছেন প্রাণবন্ত ভাষায় :

"বহুযুগ যাবৎ ভারতবর্ষ হোমকুণ্ডে যজ্ঞাগ্নি জ্বালিয়া পুনরায় তাহা নির্বাণ করিয়া অতি দুশ্চর তপস্যা করিয়া যে সিদ্ধি চাহিয়াছিল, শ্রীচৈতন্যদেব সেই সিদ্ধি। অপরাপর সাধুদের জীবনে তপস্যা আছে, কিন্তু চৈতন্য সাক্ষাৎ তপঃসিদ্ধি। অতি সহজ, বাল্মীকির কাব্য, চণ্ডীদাসের গান। রবীন্দ্রের গীতাবলি যেমন সহজ,—ইহা তেমনি সহজ। তাহাকে দেখামাত্র লোকে ভুলিয়াছে।" (বৃহৎ বঙ্গ/২য় খণ্ড/পৃ. ৬৮৫)

শুধু তাই নয়, প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমে নিষ্ঠাবান গৌড়ীয় সাধক দেখেছেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল চেতনাময় আত্মার নিত্যধর্মের পরিস্ফুটন। (দ্রঃ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য-সম্পদ ও সমাধান-সম্পদ : ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ/সমাধান সম্পদ বিভাগ, পৃ. ১৪৫)

ভারতবর্ষের সাধক সম্প্রদায় যুগে যুগে ভারতের প্রাণদেবতা পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করে গেছেন সাধনার অতল গহনে আত্মসমাহিত হয়ে। যুগে যুগে তাঁরা পরমদেবতার—বিষ্ণু, বাসুদেব, বিট্‌ঠল, ভেঙ্কটেশ্বর, মুরুগোপাল, নারায়ণ, বদরীবিশাল, শ্রীরাম—প্রভৃতি সহস্রবিধ স্বরূপের মধ্যে সে পরতত্ত্বের অনন্ত গুণ-শক্তি-লীলামাহাত্ম্যের অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। অনুসন্ধানের সে ইতিহাস বিধৃত আছে রামায়ণে, মহাভারতে, গীতায়, বিষ্ণু-ভাগবতাদি পুরাণ-সাহিত্যে, আড়বার প্রভৃতি সাধকসম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীতে, সর্বোপরি বৈষ্ণব চতুঃসম্প্রদায়ের রচনাপঞ্জীতে। কিন্তু সকল কিছুর আস্বাদন করে গৌড়ীয় সাধক দেখেছেন :

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেষ্টা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণুপুরাণের কথিত শ্রীকৃষ্ণ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদীর শ্রীকৃষ্ণ, আধুনিক আনুকরণিক নিম্বার্কানুগ ধ্রুব সম্প্রদায়ের শ্রীকৃষ্ণ বা বল্লভানুগ-গণের শ্রীকৃষ্ণ যে পরিমাণে স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নতত্ত্ব চৈতন্যদেবের উপদিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সহিত পার্থক্যলাভ করিয়াছেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ধারণায় অসম্পূর্ণতা আছে।" (ঐ বৈশিষ্ট্যসম্পদ বিভাগ, পৃ. ১২৮)

শ্রীচৈতন্যদেব তো কেবল শ্রীচৈতন্যদেব নন, তিনি "রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ,"—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, কৃষ্ণকে জানিয়ে অচেতন জগৎবাসীর চৈতন্য সম্পাদন করেন তিনি—"কৃষ্ণ জানাইয়া সব বিশ্ব কৈল ধন্য।" শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামের আর এক গূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হয়েছে গৌড়ীয় ধর্ম দর্শনে। গৌড়ীয় দর্শনমতে শ্রীচৈতন্য প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্যরূপী কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভাবতনু শ্রীচৈতন্য। তাই শ্রীকবি কর্ণপুরের নাটকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কণ্ঠে শুনি—"কৃষ্ণস্বরূপঃ চৈতন্যসঙ্গীতঃ।" (চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকং ॥ ৪/৩৯, পৃঃ ২৮৩) অর্থাৎ যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তিনি চৈতন্যরূপী. তাই শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। এ-মতের পশ্চাতে রয়েছে ঐতিহাসিক পুরুষ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বিষয়ক দার্শনিক তত্ত্ব—যার মধ্য দিয়ে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ও তাঁদের প্রেমের পরম সৌন্দর্যমাধুর্যের রূপটি বিশ্ববাসীর যুগপৎ দর্শনগম্য ও অনুভূতিগোচর হয়েছে। আর একারণেই শ্রীচৈতন্যদেব গৌড়ীয় ধর্মদর্শনে এক অপরিহার্য তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাই একাধারে তিনি ঐতিহাসিক তথ্যের আকর, আবার দর্শনের ভাবসমৃদ্ধ তত্ত্বের উৎস। ঐতিহাসিক পর্যায়ে তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের দীনভক্ত, আবার দর্শন পর্যায়ে তিনি 'রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ,—'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর।' এই রহস্যময়তার জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে কবি কর্ণপুরের শ্রীঅদ্বৈতাচার্য দ্বিধাগ্রস্ত। স্বরূপ কোন রূপ—গৌর না কৃষ্ণ! শ্রীঅদ্বৈতের তাই সংশয়ান্বিত স্বগতোক্তি :

> "কিমত্র ব্রূমহে মহেচ্ছং প্রতি যদি তবৈতদেব স্বরূপং তদা দর্শনীয় শ্যামসুন্দর বিগ্রহাভিলাষো বিশ্রান্তঃ যদি স এব স্বরূপমিত্যুচ্যতে তদাস্মিন্ প্রেমহানিরিতি ক্ষণং পরামর্শতি।"
>
> ["আহা! আমি এক্ষণে কি বলিব! যদি বলি—"আপনার এই গৌররূপই স্বরূপ', তাহা হইলে পরম সুন্দর সেই শ্যামসুন্দর রূপ দেখিতে যে বাসনা হইয়াছিল, তাহা বৃথা হয়! আর যদি 'কৃষ্ণরূপই তোমার স্বরূপ' ইহা বলি, তাহা হইলে এই গৌররূপে প্রণয়ের ন্যূনতা প্রতীত হয়। তবে আমি কি করি!"]
>
> (চৈতন্যচন্দ্রোদয় ॥ ২/৫০, অনুবাদ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন, পৃ. ১৩৫)

ভারতবর্ষের চিরায়ত ধর্মসাধনার ইতিহাসে নির্বিশেষ পরব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের আনন্দ বা হ্লাদিনীসত্তার পরিপূর্ণ জাগরণের মধ্য দিয়ে পরম প্রেমময় মধুর রসবিলাসী নরলীল শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ মাধুর্যসত্তার আবিষ্কারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান। গৌড়ীয় কবির নাটকে 'ভগবান'

নামধারী ভক্ত ও ভক্তচূড়ামণি শ্রীরায়রামানন্দের সংলাপে রায়রামানন্দকণ্ঠে এই গৌড়ীয় কৃষ্ণতত্ত্বেরই প্রকাশ :

"ভগবান—কা বিদ্যা ?
রামানন্দ—হরিভক্তিরেব ন পুনর্বেদাদি নিষ্ণাততা।
ভগবান—কা শ্রী ?
রামানন্দ—তৎপ্রিয়তা ন বৈ ধনজনগ্রামাদি ভূয়িষ্ঠতা।
... ...
ভগবান—ক হেয়ং ?
রামানন্দ—ব্রজ এব।
ভগবান—কিং শ্রবণয়োরানন্দি ?
রামানন্দ—বৃন্দাবনক্রীড়ৈকা।
ভগবান—কিমুপাস্যমত্র ?
রামানন্দ—মহসী শ্রীকৃষ্ণরাধাভিধে।"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয় ॥ ৭/১৩ ॥ পৃ. ৪২৪-৪২৬)

এই তত্ত্বই গৌড়ীয় মহাকবি শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কাব্যে শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ সংলাপে আরো বিশদ ও রসবাহী হয়ে উঠেছে। (দ্রঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥ ২/৮/১৯৯-২১০ ॥) শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং কোন দর্শনশাস্ত্র রচনা করে গৌড়ীয় প্রেমদর্শনের প্রচার করেননি সত্য, কিন্তু গৌড়ীয় গোস্বামিগণের রচনায় যে অতল অপার কৃষ্ণমাধুর্য্য ও রাধাপ্রেম গভীরতাকেন্দ্রিক গৌড়ীয় দর্শনের পরম বিস্তার,—শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ লীলাচরণই ছিল তার সর্বপ্রধান উৎস। 'প্রেমাবেশে মত্তসিংহপ্রায়' শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্তনে এই কৃষ্ণনামই ছিল এক ও অদ্বিতীয় মন্ত্র এবং বহুবিধ সাধনমার্গের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমভক্তিরসকেই শ্রীচৈতন্যদেব সকলের উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন। কবিরাজ গোস্বামী বর্ণনা করেছেন :

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে ॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান ॥"

(চৈ. চ. ॥ ২/৮/২১২-২১৩ ॥)

এই শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের পূর্ণতম রূপ অনুসন্ধানেই শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীরাধিকার ভাব-কান্তি গ্রহণ। শ্রীরাধার প্রেমের ক্ষেত্রেই শ্রীকৃষ্ণের মদনমোহনস্বরূপ মাধুর্য্যসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন :

"রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহন :।
অন্যথা বিশ্বমোহপি স্বয়ং কামমোহিতঃ ॥"

(গোবিন্দলীলামৃত ॥ ৮/৩২ ॥)

শুধু তাই নয়, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনে শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য্যও নিত্য বৃদ্ধিশীল। একে বলা হয় অসমোর্দ্ধমাধুর্য। এই অসমোর্দ্ধমাধুর্যের পথেই শ্রীরাধার প্রেমের "সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী" মাদনাখ্য মহাভাবে পরিণতি। শ্রীচৈতন্যদেবই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য পূর্ণতমরূপে আস্বাদনের একমাত্র পথ হল এই মাদনাখ্য মহাভাব, যা শ্রীরাধা ব্যতীত ব্রজপরিকরদের মধ্যে আর কারও নেই। শ্রীরূপগোস্বামীর বর্ণনায় তাই :

" ... . রাধিকা সর্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥"

(উজ্জ্বলনীলমণি ॥ শ্রীরাধাপ্রকরণ / ৩ ॥)

রাধাভাবদ্যুতি হিসাবে শ্রীচৈতন্যদেবও ছিলেন এই মহাভাবের অধিকারী সাধক। শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ দ্বাদশ বৎসরের যে দিব্যোন্মাদ দশা,—তা কাল্পনিক নয়, ভক্তবৃন্দ কর্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত একান্ত বাস্তব। এই দিব্যোন্মাদ দশায় একদিকে প্রকাশ পেয়েছে শ্রীরাধার প্রেমগভীরতার অনন্তসদৃশ স্বরূপখানি, শ্রীকৃষ্ণের অতল অপার মাধুর্যরসাস্বাদনে শ্রীরাধারই প্রেমবিহ্বলতার, বাহ্যসচেতন উন্মাদনাময় প্রেমানন্দবিভোর মানসিক অবস্থার স্বরূপ, আর এরই মাধ্যমে অপরদিকে প্রকাশিত হয়েছে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রসভনু শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত মাধুর্যসম্ভার পরিচয়। শ্রীচৈতন্যের এই সাধনা প্রত্যক্ষ করেই পার্শ্বচর শ্রীস্বরূপ গোস্বামী তাঁর 'কড়চা'য় শ্রীচৈতন্য প্রণাম করতে গিয়ে লিখেছেন :

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনীশক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম. ॥" (চৈ. চ. ॥ ১/১ উদ্ধৃত ॥)

[রাধা স্বরূপতঃ কৃষ্ণপ্রেমই, তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি। রাধা ও কৃষ্ণের সত্তা ভিন্ন নয়, কিন্তু লীলার জন্যই তাঁরা ভিন্নরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন আবার তাঁরা চৈতন্যের মধ্যেই এক হয়েছেন, প্রকট হয়েছেন শ্রীচৈতন্যরূপে। রাধার গৌরকান্তি ও কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন সেই চৈতন্যকে নমস্কার করি।]

শুধু তাই নয়, নিত্য পার্ষদ স্বরূপ গোস্বামীই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণ ব্যাখ্যা করে বৈষ্ণব সাধনায়, সাহিত্যে, দর্শনে শ্রীচৈতন্য-তত্ত্বের অবতারণা করে গেছেন ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের তিনটি অপূর্ণ বাসনার উল্লেখ করে :

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয় :।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দু : ॥"

(চৈ. চ. ॥ ১/১ উদ্ধৃত ॥)

অর্থাৎ, শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধার প্রেমের আলোকপাতে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের চমৎকারিত্ব কিরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যানুভবে শ্রীরাধার আনন্দের স্বরূপ কিরূপ, এই তিন বাসনা পরিপূরণের জন্যই শ্রীরাধার ভাবকান্তি গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভরূপ সিন্ধু থেকে উত্থিত হয়েছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব সম্পর্কে বৈষ্ণবদের এই মতবাদ যে ভক্তি-আবেগ উৎসারিত বা কাল্পনিক নয়, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ লীলাচরণই তার প্রমাণ। শ্রীরূপ গোস্বামীর দৃষ্টিতে তাই শ্রীচৈতন্যদেব ব্রজগোপীদের সমগ্র প্রেমের সারভাগ বা নির্যাস—"বিনির্যাসঃ প্রেম্নোনিখিলপশুপাসাম্বুজদৃশাং···।" (স্তবমালা / চৈতন্যস্তব ॥ ১/২ ॥) বাস্তবিক প্রেমভক্তির পূর্ণতম অভিব্যক্তি মাদনাখ্য মহাভাবের একমাত্র অধিকারিণী শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমানুভবের প্রতিটি অভিব্যক্তি একান্তে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ জীবনের দিব্যোন্মাদ দশায়, আর সেই আস্বাদের পরিপূর্ণতা হেতুই তিনি একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন শ্রীরাধাতনুর সঙ্গে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে অজস্র গৌরাঙ্গবিষয়ক ও গৌরচন্দ্রিকার পদ, তাই চৈতন্য-লীলাকেন্দ্রিক অজস্র কাব্য-নাটক পরিগণিত হয়েছে বৈষ্ণব ধর্মের বেদস্বরূপ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যদেব তাই ধর্মসাধক বা ধর্মাচার্য্য হিসাবে পূজিত হননি, গৌড়ীয় সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যদেবকেই পরতত্ত্ব এবং বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণেরই রূপান্তর হিসাবে মনে করতেন। কবিরাজ গোস্বামী লিখেছেন—"ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ।" (চৈ. চ. ॥ ১/১/৩ ॥), আর বারাণসীর কবি চৈতন্য-পরিকর শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকে শঙ্কর-নারদাদি ও ব্রজপরিকরবৃন্দ সহ বৃন্দাবন-কৃষ্ণেরই আবির্ভাব বলে বর্ণনা করেছেন তাঁর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' কাব্যে। (দ্রঃ ১১ নং শ্লোক)

শুধু তাই নয়, কবিকর্ণপুর জানিয়েছেন বৃন্দাবনের গোপীবৃন্দই নবদ্বীপলীলায় চৈতন্যপার্শ্বচর হিসাবে পুরুষদেহ ধারণ করে বৃন্দাবনের স্বভাবানুযায়ী শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে লীলা করেছিলেন :

"গৌরেণ তৎপ্রিয়ৈঃ সার্ধং ধৃতপুরুষবিগ্রহাঃ।
খেলান্ত স্ম স্বভাবানুসারাস্তাঃ ক্রমশো যথা॥"

(গৌরগণোদ্দেশদীপিকা / ১৯৮)

এই আদর্শই ভক্তিআতিশয্য ও আবেগাতুর কবিকল্পনায় পল্লবিত হয়ে নরহরি সরকার, বাসু ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, রামানন্দ বসু প্রমুখ চৈতন্যসমসাময়িক কবিবৃন্দের রচনায় গৌরপারম্যবাদ ও গৌরনাগরভাবের বিকাশ ঘটিয়েছিল। যেমন, বাসুদেব ঘোষের একটি পদ :

"যখন দেখিনু গোরাচাঁদে।
তখনই পড়িনু প্রেমফাঁদে॥
তনুমন তাঁহারে সঁপিনু।
কুলভয়ে তিলাঞ্জলি দিনু॥" শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী॥ ৩য় তরঙ্গ / ২য় উচ্ছ্বাস / পদ সংখ্যা ১২॥)

কিংবা কবি নরহরি সরকারের একটি পদ :

"বেলি অবসানে ননদিনী বনে জল আনিবারে গেনু।
গৌরাঙ্গচাঁদের রূপ নিরখিয়া কলসী ভাঙ্গিয়া এনু॥
... ...
দীঘল দীঘল নয়ন যুগল বিষম কুসুম-শরে।
রমণী কেমনে ধৈরয ধরিবে মদন কাঁপয়ে ডরে॥" (ঐ/পৃ. ১১৩)

এ ধরণের অজস্র গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সঙ্কলিত হয়েছে 'শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী' 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি সঙ্কলন গ্রন্থে। স্পষ্টই বোঝা যায় দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ এ সকল পদের উদ্দেশ্য নয়, শালীনতার সীমাও এ সকল পদে সর্বত্র রক্ষিত হয়নি, তাহলেও বৈষ্ণব ধর্মে শ্রীচৈতন্যদেবের স্থানটিকে এগুলি থেকে অনায়াসেই চিনে নেওয়া যায়। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ রচিত কাব্য দর্শনাদিতে প্রকাশিত বৈষ্ণবধর্মে শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি যে অমূলক নয়, তার একাংশের প্রমাণ যে এই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদগুলি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন যে নানাবিধ ধর্মসাধনা ও ধর্মসাধকসম্প্রদায় পরিপূর্ণ ভারতবর্ষে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়েছিল, তার পশ্চাতে

কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গসাধন মহিমা নয়, বাহ্যিক কতকগুলি কারণও ছিল। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য কারণটি হ'ল শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্মের সাম্প্রদায়িক মনোভাবশূন্যতা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছেই শ্রীচৈতন্যদেব উদার প্রেমভক্তিধর্মের রসস্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছেন। মূর্তিপূজার বা ঈশ্বরের সাকার অস্তিত্বজ্ঞানের বিরোধী মুসলমান ধর্মাবলম্বী পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যের উদার প্রেমধর্মের প্রভাবে নিষ্ঠাবান গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভক্তে পরিণত হয়েছেন, এঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন যবন হরিদাস। গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ না করলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মদ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন দাসের শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় দেখি, সুলতান হুসেন শাহ শ্রীচৈতন্যদেবকে ঈশ্বর বলেই মনে করতেন :

"হিন্দু যাঁরে বলে কৃষ্ণ খোদায় যবনে।
সেই তিঁহ নিশ্চয় জানিহ সর্বজনে॥"

তাই শ্রীচৈতন্যদেবের নাম সঙ্কীর্তন প্রচারে কাজি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে ক্রোধাবিষ্ট সুলতান বলেছিলেন :

"কাজি বা কোটাল বা তাঁহাকে কোন জনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥"

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত উদার প্রেমধর্মের সাম্প্রদায়িক মনোভাবশূন্যতার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ বহু মুসলমান কবি-কর্তৃক রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গবিষয়ক, পদরচনা। অথচ মুসলমান ধর্মাবলম্বিগণ মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। যেমন সৈয়দ মর্তুজার নিবেদনের পদ :

"সৈয়দ মর্তুজা ভনে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিলু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি॥"
(বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন মুসলমান কবি / পদসংখ্যা ১১২)

কিংবা কবি আলীরাজার পদে শুনি শ্রীরাধার আক্ষেপানুরাগ :

"কি খেনে আসিলাম ঘাটে।
নন্দের নন্দন ভুবন মোহন দেখিয়া মরম ফাটে॥" (ঐ)

অথবা কবি ইরফানের অন্তিম আকুতি শুনি—"শ্যামের চরণ যেন পাই।" (ঐ / ১৭) কিংবা নসীর মামুদের ভণিতা—"নসীর মামুদ করত আশা চরণে শরণ জানহি॥" (ঐ / ৫২) এসকল পদ মুসলমান কবিগণের নিষ্ঠাভক্তি পরিপূর্ণ বৈষ্ণব-প্রাণতাকেই প্রকাশ করেছে। এঁরা পদ-রচনায় বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসকে অনুসরণ করেছেন সত্য, কিন্তু এই বৈষ্ণব-মনস্কতার পশ্চাতে

একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের অবদানটিকে কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। মুসলমান কবিগণও তাঁদের কর্ণে প্রেমমন্ত্রদাতা এই প্রেমময় মানুষটির প্রতি নিঃশেষে অর্পণ করেছেন হৃদয়ের শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, নিষ্ঠা। ভক্ত কবি হুসেনকে তাই বলতে শুনি : "গোরা চান্দ আমার। / তোমার লাগি আমি ঘরের বার॥" (ঐ / ১২১) এমনকি তৎকালীন দিল্লীশ্বর আকবর বাদশাহ পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমাদর্শে মুগ্ধ হয়ে শ্রীচৈতন্যের প্রেম ভিক্ষা করে ব্রজবুলি ভাষায় গৌরাঙ্গস্তোত্র রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন :

"জিউ জিউ মেরে মনচোরা গোরা।
আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥
... ...
ঐছন পহুঁকে যাহু বলিহারী।
শাহ্ আকবর তেরে প্রেম-ভিকারী॥" (শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী ৪/২/২৯॥)

শ্রীরূপগোস্বামী সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে ধৃত শ্রীচৈতন্যদেবের উক্তি হিসাবে প্রচলিত একটি শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের জাতিভেদনিরপেক্ষ সার্বজনীন মনুষ্যত্বের পরিচয়টি আরো প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে :

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নো বা বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে—
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাস : ॥" (পদ্যাবলী / ৭২)

[আমি বিপ্র, নরপতি, বৈশ্য বা শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রমের কোনটার ব্রতী নই। কিন্তু যিনি পরমানন্দপূর্ণ অমৃত সমুদ্রের ন্যায় পূর্ণরূপে বিকাশিত সেই গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয়ের দাসেরও দাসানুদাস।]

ধর্ম সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র বক্তব্য ছিল—কৃষ্ণপ্রেমভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। কৃষ্ণপ্রেমভক্তির মানদণ্ডেই মানুষের মূল্যবিচার। সেক্ষেত্রে—"চণ্ডালাপি বৈ শ্রেষ্ঠাহরিভক্তিপরায়ণাঃ।" (হরিভক্তিবিলাস : শ্রীসনাতন গোস্বামী) গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃতপক্ষে এই প্রেমভক্তিধর্ম।

শ্রীচৈতন্যদেব তাই বৈষ্ণব ভক্তের দৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভজনাকারীদের বরং মুক্তিদান করেন, কিন্তু প্রেমভক্তি সকলকে দান করেন না :

"... ... ... ভজতাং ভগবান্মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।"

(ভাগবত ॥ ৫/৬/১৮ ॥)

আবার অপরদিকে, গৌড়ীয় মতে যেহেতু সম্ভোগ তথা মোক্ষবাসনায় প্রেমলাভ ঘটে না, প্রেমরসমাধুর্যের নিত্য প্রস্রবন বিপ্রলম্ভাদর্শের কৃষ্ণতন্ময়তায়, এবং শ্রীচৈতন্যলীলায় সেই বিপ্রলম্ভাত্মক প্রেমমাধুর্যেরই নিত্য প্রকাশ, সে হিসাবেও বৈষ্ণবদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীচৈতন্যদেব শ্রেষ্ঠ। তাই গৌড়ীয় সাধক-গণের অনুভবে ধরা পড়েছে :

"শ্রীকৃষ্ণ সম্ভোগময় বিগ্রহ, আর শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভ বিগ্রহ। বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ গৌরসুন্দরের সম্ভোগময়ী লীলাই শ্রীকৃষ্ণলীলা। ... ...আবার সম্ভোগময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের বিপ্রলম্ভময়ী লীলাই গৌরলীলা।"

(শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বৈশিষ্ট্য সম্পদ ও সমাধান সম্পদ : সমাধান সম্পদ বিভাগ, পৃ. ৭০)

অতএব যেহেতু 'ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে", সেই হেতু শ্রীচৈতন্য ব্যতিরেকে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্যও বৈষ্ণবদের নিকট পুষ্টিলাভ করতে পারে না। তাই গৌড়ীয় কবির রচনায় শ্রীচৈতন্য বিতরিত অযাচিত প্রেমভক্তিলাভের জন্য গৌড়ীয় ভক্তগণ ব্যাসদেব উদ্ধবাদি মহর্ষিগণ অপেক্ষাও অধিক সৌভাগ্যসুখের অধিকারী বলে বর্ণিত হয়েছেন :

"ভ্রান্তং যত্র মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন ক্ষমা মণ্ডলে
কস্যাপি প্রবিবেশ নৈব ধিষণা যদ্বেদ নো বা শুকঃ।
যন্ন ক্বাপি কৃপাময়েন চ নিজেপ্যুদ্ঘটিতং শৌরিণা
তস্মিন্নুজ্জ্বলভক্তি-বর্ত্মনি সুখং খেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥"

(চৈতন্যচন্দ্রামৃত / ১৮)

[ব্যাসদেবাদি মহর্ষিগণও যে মধুর ভক্তিমার্গে ভ্রান্ত হয়েছেন, পূর্বে যে ভক্তি পৃথিবীর কারও বুদ্ধিদ্বারা প্রকাশিত হয়নি, এমনকি স্বয়ং ঋষি শুকদেবেরও অজ্ঞাত ছিল, যা কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণ কোন ভক্তের নিকট উদ্ঘাটিত করেননি,— সেই উজ্জ্বল বা মধুর ভক্তিপথে গৌরাঙ্গ-প্রিয় ভক্তগণ সুখে ক্রীড়ারত।]

শ্রীচৈতন্যদেবের এই বিরাটত্ব ও উদার প্রেমমহিমাই চৈতন্যপূর্ব বৈষ্ণব চতুঃ-সম্প্রদায়ের (শ্রী-ব্রহ্ম-সনক-রুদ্র) ঊর্ধ্বে পঞ্চম সম্প্রদায় হিসাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে সমগ্র ভারতবর্ষে প্রবাহিত করে ও সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করে। শ্রীচৈতন্যদেব তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ তো বটেই,

ভারতবর্ষের সমগ্র বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসেও তিনি নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। বৈষ্ণব ধর্মের প্রাণদাতা রূপেই তাঁকে বৈষ্ণবেরা নিবেদন করেছেন পরম ভক্তি-অর্ঘ্য :

"নমশ্চৈতন্যরূপায় পুরন্দর সুতায় চ।
বৈষ্ণব প্রাণদাত্রেব গৌরচন্দ্রায় তে নমঃ॥"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতম্ : শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ,
পৃ. ৪৪ ৫কৃতীর্থ / পুরী সংস্করণ)

ফেলে আসা দিনগুলি

জগদীশ নারায়ণ সরকার

[লেখক শ্রুতকীর্ত্তি ঐতিহাসিক : ভারত ইতিহাসের মুসলিমযুগ সম্বন্ধে অন্যতম প্রামাণিক বিশেষজ্ঞ ও নির্ভরস্থল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। তবে এঁদের তুল্য জ্ঞানবৃদ্ধেরা সর্বদাই নিরবকাশ—জ্ঞানান্বেষণ ও গ্রন্থ রচনায় তিনি এখনো ক্লান্তিহীন। আমাদের বিশেষ অনুরোধে ইনি তাঁর প্রথম ও মধ্যজীবন সম্পর্কে কিছু কিছু স্মৃতিচারণ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ।—সম্পাদক, আলেখ্য]

আত্মকথার বা autobiography-র এক বিশিষ্ট গুরুত্ব আছে। প্রকৃত আত্মকথায় থাকবে সর্বব্যাপকতা, যাকে ইংরাজীতে বলব universal appeal. নিছক স্বকীয় জীবনধারার কথায় কোনই মূল্য থাকে না যদি না তার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজ, সামাজিক ও রাজনীতিক বা সাংস্কৃতিক সমস্যা যুক্ত থাকে। তাই স্মৃতিচারণ হ'ল প্রখ্যাত জ্ঞানী, গুণী, রাষ্ট্রীয় বা সমাজ-নেতাদের ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি ত' সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে এক অবিনশ্বর সৃষ্টি। আচার্য রমেশচন্দ্রও নিজের আত্মকথা লিখে গেছেন। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন মহাশয়ও লিখেছেন। এগুলিরও একটা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য আছে। আমার পাটনার ৫৫ বৎসরের বন্ধু ও সতীর্থ ৺কালিকিঙ্কর দত্তও তাঁর

আত্মজীবনী ইংরাজীতে লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু সেটি শেষ হয়েছিল বা প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না। আমার কলকাতার ২১ বৎসরের বন্ধু শ্রীপ্রতুলচন্দ্রগুপ্তও লিখেছেন, তবে এখনও দেখি নাই।[১]

জীবনের উষাকাল থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত স্মৃতিচারণ করতে গেলে স্মৃতিশক্তি কতটা প্রখর হওয়া প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। তার সঙ্গে থাকা চাই কল্পনার দৌড়, সাবলীল ভাষা। আমি সাহিত্যিক নই, কবির কল্পনারও ধার ধারিনা, ভাষার উপরেও কোন দখল নাই। স্মৃতিচারণ যে করব, স্মৃতিশক্তিতেও ভাটা পড়েছে। আমি নিজেকে এখনও ছাত্রই ভাবি। জ্ঞানী গুণীর স্তরে প্রোমোশন পেয়েছি বলে মনে করিনা। যতই লেখাপড়া করি, ততই মনে হয় যেন টর্চের সীমিত রশ্মির পরিধির বাইরে সবই নীরন্ধ্র অন্ধকার। কিছুই দেখিনা, কিছুই জানিনা। তাছাড়া আমি আমার গুরু আচার্য যদুনাথের মত নিঃশব্দে কাজ করি। কই, তিনি ত' কোনদিন আত্মজীবনী লেখেন নাই। তাঁর সময়ও ছিল না।

যদি আপনাদের আশাভঙ্গ করি তা হ'লে আমার অক্ষমতা ক্ষমা করবেন। প্রথমে ভেবেছিলাম যে আমার ছাত্রজীবন ও শিক্ষক জীবন সম্বন্ধে কিছু বলব। কিন্তু সময়াভাবে এখন শুধু প্রথমটি সম্বন্ধেই বলছি।

এই স্মৃতিচারণে যে পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক ঘটনা বেশী সাহায্য করেছে এমন কিছু কিছু ঘটনার সংযোজন আছে। স্কুল ও কলেজে বিহারের শিক্ষা পদ্ধতি, তার ত্রুটি, গুণ বা বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তদশ শতকে প্রখ্যাত ফরাসী পর্য্যটক মঁসিয়ে বার্নিয়ে এদেশে যে সামাজিক শ্রেণীর অস্তিত্বই একেবারে অস্বীকার করেছিলেন,—যদিও ভ্রমবশতঃ,—আমাদের পরিবার সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত। আমরা উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ও সুবিখ্যাত ভূষণার জমিদার রাজা সীতারাম রায়ের জ্ঞাতিগোষ্ঠীভুক্ত। তবে সীতারামের বিদ্রোহী মনোভাব আমাদের পরিবারবর্গকে অনুপ্রাণিত করে নাই। কৈশোরে বঙ্কিমের 'সীতারাম' পড়তে পড়তে যে দেশপ্রেমিক বীর কল্পনায় উদ্ভাসিত হ'য়েছিল উত্তরকালে ইতিহাসের কষ্টিপাথরে তার সত্যতা যাচাই হ'য়ে যায়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে যখন বিহার ও উড়িষ্যা বঙ্গপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন আমার বয়স পাঁচ বছর। বাবা[২] বঙ্গপ্রদেশ ছাড়লেন। আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে এটা একটা স্মরণীয় ঘটনা যার গুরুত্ব পরবর্তী জীবনেই প্রতীয়মান

হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে ত' বটেই, চাকুরীর ক্ষেত্রেও। উড়িষ্যা ও বিহারের স্কুলে আমার কেটেছে ৮ বৎসর (১৯১৫-২২),—সম্বলপুর, পুরুলিয়া, পাটনা ও ভাগলপুরে। বাবা তখন সবজজ, পাটনা থেকে বদলী হয়ে সম্বলপুর গেছেন। সেখানে ছোট্ট একটি কো-এডুকেশন্যাল স্কুল। আজ আমার প্রথম স্কুলের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে। আমার চেয়ে চার বছরের বড় ছোটদিদি ও আমাকে নিয়ে আমার মা সেখানে ভর্ত্তি করাতে গেছলেন। অদূরেই মহানদী। তার অল্প জলে দাঁড়িয়ে আমরা নুড়ি, কষ্টিপাথর সংগ্রহ করেছিলাম আমার মনে আছে। তার মধ্যে একটা 'জামাই-ঠকানো' নুড়ি ছিল, রসে ফেলে দিলে ঠিক রাজভোগের মত দেখতে লাগল। তারপর পুরুলিয়া। সেখানে মানভূম ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশনে (১৯১৬) ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে রীতিটি মনে দাগ কেটেছিল এখনও মনে আছে সেটি হ'ল যে, শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে ছাত্রকে তার রোলনম্বর অনুযায়ী সিট থেকে নামিয়ে, আর উত্তর দিলে উঠিয়ে দেওয়া হ'ত। এতে ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার ভাব আসত ও পঠনশীলতায় অভ্যাস বাড়াত। শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন হেডমাষ্টার। আর একজন শিক্ষক যাঁর নামের সঙ্গে পরে মানভূম জেলার সবাই পরিচিত হয়েছিল ও যিনি স্কুলের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন তিনি হলেন শ্রীজহরলাল বসু।[৩] মজার ব্যাপার হ'ল একটা পিরিয়ড শেষ হ'লে দোতলা থেকে হাঁক পাড়তেন সহকারী প্রধান শিক্ষক, 'জয় ঘণ্টা দে', আর জয় তখন ঘণ্টা বাজাত। একদিন ঘড়ি খারাপ হওয়ায় ঘণ্টা বাজাতে দেরী হয়ে গেছল। স্কুলে রেজাল্ট খুব একটা ভাল হয় নাই তবে 'গুড কনডাক্ট' প্রাইজ পেয়েছিলাম একটি বই, 'The Bravest of All'—বাবা তখন কঠিন অসুখে শয্যাশায়ী, আমায় আশীর্বাদ করলেন।

বাবার মৃত্যুর পর আমার বড়মামা[৪] মা, ছোড়দি ও আমাকে পাটনায় নিয়ে এলেন। সেখানে এঙ্গলো-সংস্কৃত স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হ'লাম (১৯১৭)। এই স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়। তাঁর সময়ে স্কুলের নামডাক খুব ছিল, এখানেই আমার মাতুলরা সব শিক্ষালাভ করেছিলেন। ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল। তবে বছরের মাঝেই অভিভাবক বড়মামার বদলীর জন্য ভাগলপুরে চার্চ মিশনারী সোসাইটির (C. M. S) হাই-স্কুলে ভর্ত্তি হ'লাম একবছর পরে, কিন্তু ঐ পঞ্চম শ্রেণীতেই, কারণ সেখানে যে টেষ্ট হয় তাতে উত্তীর্ণ হ'তে পারি নাই। এই সময় ক্লাসের নতুন নামকরণ হয়। পঞ্চম শ্রেণী হ'ল ক্লাস VIII, চতুর্থ শ্রেণী হ'ল ক্লাস IX, তৃতীয় শ্রেণী

হ'ল class X, দ্বিতীয় শ্রেণী হ'ল class XI (প্রি—ম্যাট্রিক), আর প্রথম শ্রেণী হ'ল class XII (ম্যাট্রিক)। এখানে Infant class ও ছিল,। খেলাধূলার জন্ত বিরাট মাঠ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। টাওয়ার ও গ্যালারী সহ বিরাট হল। আর হেডমাষ্টার ছাড়াও থাকতেন একজন প্রিন্সিপ্যাল। এখানে আমার শিক্ষার বুনিয়াদ পোক্ত হয়। বৎসরে তিনটি periodical পরীক্ষা নেওয়া হ'ত। মে মাসে, পূজার আগে ও ডিসেম্বরে। ধীরে ধীরে ক্লাসের পরীক্ষাগুলিতে ভাল ফল ফলতে লাগল, প্রথমে ষষ্ঠ, তারপর ক্রমান্বয়ে চতুর্থ, তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম। গোড়ায় Class IX-এ সত্যনারায়ণ সিংহ বলে একটা বিহারী ছাত্র প্রথম হত। সে নন-কো-অপারেশন মুভমেণ্টে যোগদান করে স্কুল ছেড়ে দেয়। পরে যখন আবার ফিরে এল তখন তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছল। পড়াশুনাতেও আর আগেকার মত ফল দেখাতে পারে নি। আমি থার্ড ক্লাস (Class X) থেকে সব পরীক্ষাতেই প্রথম হই। স্কুলের একটি বিশেষত্ব ছিল যে প্রত্যেক ছাত্রের একটি করে' 'প্রোগ্রেস রিপোর্ট' খাতা থাকত। তাতে ক্লাসের বিশেষ শিক্ষক, প্রিন্সিপ্যাল বা হেডমাষ্টার, অভিভাবক সকলেরই দস্তখত থাকত। পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর, সর্বাপেক্ষা বেশী প্রাপ্ত নম্বর ত' টার্ম অনুযায়ী থাকতই, তাছাড়া Attendance (বাৎসরিক উপস্থিতি) ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও রিপোর্ট থাকত। বৎসরের পর বৎসর এতে রিপোর্ট লেখা হত। আজকালকার মত বাৎসরিক রিপোর্ট নয়। এই রেজিষ্টারটি স্কুল থেকে চলে এলে ছাত্রের কাছেই থাকত। আমার রেজিষ্টারটা এখনও আমার কাছেই আছে। অধুনা হয়ত ধারণার অতীত যে মুখ্য বিষয়গুলি ছাড়াও হাতের লেখা, ড্রয়িং, রিডিং ও শ্রুতিলিখনের জন্যও সাপ্তাহিক ক্লাস থাকত, পরীক্ষাও হত ও প্রাপ্ত নম্বরও উক্ত রেজিষ্টারে লেখা হত।

আমার বিশেষ সৌভাগ্য বলতে হবে যে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত আমার অভিভাবক বড় মামা ভাগলপুর থেকে বদলী হন নাই ও সেজন্ত আমি এই স্কুল থেকেই ১৫ বৎসর ৫ মাস বয়সে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা পরিচালিত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা ও বিহার ও উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্ট দ্বারা পরিচালিত স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষা দিতে পেয়েছিলাম (১৯২৩)। রেকর্ড মার্ক পেয়ে প্রথমটিতে বিহার ও উড়িষ্যায় প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে দ্বিতীয় হয়েছিলাম।[৫] এর আগে স্কুলে এত ভাল ফল হয় নি। দ্বিতীয়টিতে প্রথম হন ভাগলপুর জিলা স্কুল থেকে দীপনারায়ণ সিংহ, যিনি পরে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল হয়েছিলেন।[৬]

আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবনে যতটুকু সাফল্য অর্জন করেছি তার জন্য এই স্কুলের কাছে আমি বহুলাংশে ঋণী। প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জনপ্রিয়, ছাত্রবৎসল রেভারেণ্ড শিশির কুমার তরফদার। তিনি S. K. Tarafdar বা তরফদার সাহেব বলেই ভাগলপুরে সমধিক পরিচিত ছিলেন। ইনি পরে Canon ও Assistant Bishop of Calcutta হন। তিনি ম্যাট্রিক ক্লাসে ইংরাজী পড়াতেন। তাঁর অকলঙ্ক চরিত্র ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহার আমি এখনও ভুলতে পারি নাই। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর স্কুলে Flower Show হয়েছিল। তরফদার সাহেব আমার দু কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "জগদীশ, আবার কবে আসছ?" আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। বহুকাল পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার পর, রেভারেণ্ড ডি. মেলো যখন কলিকাতার বিশপ, তখন সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্রেলের হলের মেজেতে তরফদার সাহেবের নামে যে ফলক আছে, সেখানে বিশপ ডি মেলো নিয়ে যান ও সেখানে আমি প্রণাম করি। হেডমাষ্টার ছিলেন সুশীলকুমার মল্লিক, ইতিহাস পড়াতেন। Class X এ Vincent Smith-এর Oxford Students' History of India পড়ান হত। এই বইএর ইংরাজী কঠিন বলে Class XI এ Prothero & Vidyabhusan-এর ইতিহাস চালু হল। কিন্তু ২টি বইএ আকাশপাতাল তফাৎ। তখন থেকে আমি অন্যান্য বই (প্রায় ১২।১৬টি) দেখে নিজে নোট তৈরী করতে লাগলাম।[৭] Class XI এর বাৎসরিক পরীক্ষায় আমার ইতিহাসে নম্বর উঠেছিল ৯১। কলিকাতার সেণ্ট পলস-এর হারফোর্ড সাহেব তখন ভাগলপুরে আসেন ও আমার উত্তর তাঁকে দেখান হয়। টেষ্ট পরীক্ষার আগে Revision Class-এ 'Ancient Indian Art'-এর উপর আমার উত্তরটি ক্লাসে মল্লিক সাহেব পড়ে শোনান। তাতে বিহারী কোন সতীর্থ বলেছিল "জগদীশ, তুম্ নোট লিখো"। তিনি বল্লেন, "কেন, নোট লিখবে কেন, বই লিখবে"। আজ তাঁর কথা প্রায়ই মনে হয়। 'চন্দা সাহেব (যতীন্দ্রনাথ চন্দ্র) আমাদের অঙ্ক (Additional Mathematics সহ) ও ভূগোল পড়াতেন। তিনিই প্রথম শেখান যে 'rough' খাতা না করে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য home work, class work-এর খাতা করতে। তিনি যে নিয়মানুগত (methodical) কাজ করতে শিখিয়েছিলেন তাতে আমার প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছিল। শিক্ষক-জীবনেও আমি আমার ছাত্রদের এই উপদেশই দিতাম, 'চন্দা সাহেবে'র নামও তাদের কাছে করতাম। কেউ কেউ তা গ্রহণ করত। অনেকেই করত না। না করাই

বাস্তবে সহজ, করাটাই বিড়ম্বনা। প্রৌঢ় মোহন হেমব্রম কিছু বাইবেল পড়াতেন। তিন বৎসর Scripture-এর জন্য প্রথম প্রাইজ পাই। বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ইংরাজী ও বাঙলা, ও পণ্ডিত পুলকিত মিশ্র সংস্কৃত পড়াতেন। আমাদের সময় প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত সঙ্কলনের বদলে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্কলন চালু হল, কিন্তু বইটি মুদ্রণে দেরী হওয়ায় আমাদের অযথা ক্ষতি হয়।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর পাটনা কলেজে আমি প্রথমে আই এস সি নিই। স্কুলের ঘরোয়া আবহাওয়া এখানে ছিল না। গঙ্গাতীরে ডাচ্ আমলের পুরানো ইমারত। পুরু পুরু দেওয়াল, লম্বা বড় বড় জানালা কপাট। বিহারের সবচেয়ে নামজাদা কলেজ, বাঙলার প্রেসিডেন্সীর অনুরূপ, ব্রিটিশ আমলের কড়া শাসন। প্রিন্সিপ্যাল তখন অস্থায়ী—E. A. Horne, I. E. S., অর্থনীতির অধ্যাপক, এঁর রচিত ভারতীয় বৃটিশ শাসন পদ্ধতির উপর বইও আছে। বড় বড় অধ্যাপক, কাছে যেতেই ভয় করত। লেকচার দিতেন, চলে যেতেন। ক্লাশ হত এক ঘণ্টায়, দু পিরিয়ডের মাঝে ৫ মিনিট ফাঁক থাকত, এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যাবার জন্য, তাই আর একটা ঘণ্টা বাজত। শিক্ষকরা সময়ানুবর্তী হতেন। আজকাল কোথায় গেল সেই সময়ানুবর্তিতা? অধ্যাপকরা ত' অনেক সময় ১৫।২০ মিঃ পরে আসেন, রোল কল করেন, ৪৫।৫০ মিঃ-এর ক্লাসে পড়ানর কতটুকু সময়ই বা বাঁচে? ছাত্ররাই বা সময়ানুবর্তিতার গুণ শিখবে কি করে? আমার জীবনের ৬০-৭০ বছরের মধ্যে লক্ষ্য করেছি স্কুল কলেজে শিক্ষার স্বরূপ, পদ্ধতি ও আবহাওয়ার কি বিরাট পরিবর্তন! উন্নতির জন্য চেষ্টা-চরিত্র করা হয়েছে বিস্তর, কিন্তু নীট পরিবর্তনের ফল? উন্নতি না অবনতি? পদ্ধতি? মান? আবহাওয়া? কোথায় গেল সেই আগেকার মধুর গুরুশিষ্য সম্পর্ক? (ক্রমশ)

পাদটীকা

১. সর্বশ্রী সুকুমার সেন ও প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়দের সম্বন্ধে এখানে কিছু পরিচয় দিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। ৺কালিকিঙ্কর দত্ত (১৯০৫-৮২) একজন অন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন ঐতিহাসিক। দেশ পাকুড়, সাঁওতাল পরগণা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের কৃতীছাত্র। বি. এ. ও এম. এ পরীক্ষায় ক্রমান্বয়ে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান

অধিকার করেন। বিহার উড়িষ্যা গভর্নমেণ্ট রিসার্চ স্কলার (১৯২৮-৩০)। পাটনা কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক, প্রধানাধ্যপক ও অধ্যক্ষ (১৯৩০-৬০)। ডাইরেক্টর, K. P. Jayaswal Research Institute, পাটনা। ভাইস-চ্যান্সেলার মগধ ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়; ডাইরেক্টর, বিহার ষ্টেট আরকাইভস্। শুনেছি 'Sulabh Internationals' তার আত্মকথা ছাপবে।

২. আমার বাবা ৺পূর্ণচন্দ্র সরকার (১৮৬০—১৯১৮)। দেশ চন্দ্রকোনা, জেলা মেদিনীপুর। বিহার জুডিশিয়াল সারভিস।

৩. ৺জহরলাল বসুর এক ছেলে শ্রীসনতকুমার বসু, Institute of Management-এর ইতিহাসের শিক্ষক।

৪. আমার বড়মামা ৺অমরেন্দ্রনাথ দাস। দেশ চন্দ্রকোনা, জেলা মেদিনীপুর। বিহার একৃজিকিউটিভ সারভিস, ভাগলপুরে, ১৯১৭-২৩, P. A. to Commissioner ছিলেন। পরে রায়বাহাদুর, ডিষ্ট্রিক ম্যাজিষ্ট্রেট, সেক্রেটারী, বোর্ড অফ রেভেনিউ, O. B. E.। এঁর কনিষ্ঠভ্রাতা ৺গোপেন্দ্রনাথ দাস কলিকাতা হাইকোর্টের জজ ও পরে ল' কমিশনের মেম্বার ছিলেন।

৫. ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ইতিহাসে আমার উত্তর দেখে পরীক্ষক (Late Md. Qasim of New College, Patna) সন্দেহ করেন যে আমি নকল করেছি ও প্রধান পরীক্ষকের কাছে (Principal K. P. Mitra, D.J. College, Monghyr) রিপোর্টও করেন। কিন্তু তিনি ভিন্ন মত পোষণ করেন ও আমি ইতিহাসে ৯০% এর বেশী পেয়েছিলাম। আসলে আমি যে স্কুলে বিভিন্ন বই থেকে নোট তৈরী করেছিলাম এ তারই ফল। প্রথম হওয়ার জন্য 'গিধৌড় স্বর্ণপদক' পাই। তবে দেওয়া হয়েছিল ২ বছর পরে, দরখাস্ত করার পর।

৬. ৺দীপনারায়ণ সিংহের পিতা এখনও জীবিত আছেন, কলিকাতাতেই থাকেন। নাম রণজিৎ সিংহ, ভাগলপুরের খ্যাতনামা আইন-ব্যবসায়ী। তিনি সেখানকার আর একজন প্রখ্যাত আইন-ব্যবসায়ী ৺চন্দ্রশেখর সরকারের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। চন্দ্রশেখর সম্পর্কে আমার জেঠামশায় হ'তেন। দীপনারায়ণের এক ভাই উজ্জ্বলনারায়ণ পাটনা হাইকোর্টের জজ, পরে প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

৭. ৫নং টীকা দ্রষ্টব্য।

(১৫৪ পৃষ্ঠার পরের অংশ)

সমীর বলিল, যে সমাজে শিক্ষার উদ্দেশ্য উপার্জন ও চাকুরি লাভ মাত্র, সেখানে স্ত্রীলোকদেরকেও সেই একই শিক্ষাদান—শক্তি ও সম্পদের অপব্যয় মাত্র। সূত্রধর, কর্মকার বা মেকানিক যেরূপ বিশেষ এক শ্রেণীর দক্ষতা অর্জন করে এবং তদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত পুরুষ সমাজও সেইরূপ কিছু কলমপেষা ও বুলি কপচানো শেখে এবং তাহা দ্বারা দক্ষিণহস্তের কাজ সম্পন্ন করার মতো কড়ি সংগ্রহ করিয়া আনে। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের লক্ষ্য এই শিক্ষাপদ্ধতির চতুঃসীমায় নাই। এই শিক্ষায় বঞ্চিত হওয়ায় নারীসমাজের খুব বেশী ক্ষতি হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। নারীর কাজ ভালবাসিয়া সমস্ত সংসারকে আপন করা এবং স্নেহ প্রীতি ভক্তির রসধারায় সকল চিত্তকে সরস রাখা। এই স্বভাবনিরূপিত শিক্ষা কি সে তার গৃহপরিবেশে মা-খুড়ি, মাসী-পিসী, ঠাকুমা-দিদিমার কাছে সর্বদা দেখিয়া শুনিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো আত্মস্থ করে না? নারীর কাজ আপনাকে ও স্বীয় পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন, রুচির ও শ্রীমণ্ডিত করা। এ শিক্ষাও কি সে আপন স্বভাবের প্রবর্তনায় গৃহপরিবেশেই লাভ করে না? সংযম ও শালীনতা নারীর ভূষণ: ইহার শ্রেষ্ঠ পাঠ কি সংসারের মধ্যেই আপন মাতৃমণ্ডলীর আচার আচরণ ও অনুশাসনেই সে প্রতিনিয়ত লাভ করে না? ধর্মনীতি ও কর্মনীতির আদর্শও তাহারা রামায়ণ-মহাভারত ও নানা পুরাণ-কাহিনীর মধ্যেই গুরুজনমুখে অনায়াসে লাভ করিয়া থাকে। নিত্য পূজার্চনা ও ব্রতপালনের মাধ্যমে ভগবদ্‌ভক্তি ও ত্যাগনিষ্ঠ পবিত্রতার আদর্শে দীক্ষালাভ ও গৃহপরিবেশেই ঘটিয়া থাকে। গৃহকে সুন্দর আনন্দময় ও পুণ্যস্নিগ্ধ করা—ইহাই কি নারীর সর্বোচ্চ কর্তব্য নহে? ইহার জন্য তাহাদের ফিজিক্স, কেমিষ্ট্রি, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ক্যালকুলাস প্রভৃতি অধিগত করা কি অপরিহার্য মনে হয়? এবং যেখানে পুরুষের ক্ষেত্রেও অধিকাংশত এই সকল পাঠগ্রহণের কার্যকারিতার মেয়াদ পরীক্ষা পাশ ও চাকুরিলাভ পর্যন্তই বজায় থাকে, সেখানে মেয়েদের এইসব শিখাইতে গিয়া তাহাদের উচ্চতর ও মহত্তর শিক্ষালাভে প্রতিবন্ধকতা ঘটানো কি যুক্তিযুক্ত? আমার তো মনে হয় নারীদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নতরই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ক্ষিতি কহিল, শিক্ষার প্রশ্নটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল মেয়েদের মধ্যে হুজুগ উঠিয়াছে তাহারা সর্বক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিবে এবং পুরুষের অনুসৃত একাধারে তথ্যবহুল ও অ্যাবষ্ট্র্যাক্ট বিদ্যার্জনে পারঙ্গম হইবে। এমন

কি পুরুষালি খেলাধূলা যেমন, ফুটবল ক্রিকেট কুস্তি বক্সিং প্রভৃতিতেও তাহারা মহড়া দিতে সুরু করিয়াছে। অর্থাৎ একদিকে পুরুষের ন্যায় কঠোর পরিশ্রমী বিদ্যাভ্যাসে পুরুষের ন্যায় ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার কেরানী অফিসার ইত্যাদি হওয়ার সাধনায় যেমন তাহারা নিরত, তেমনি পুরুষদের রূঢ় অসুন্দর পেশীবহুল খেলা-ধূলাতেও তাহাদের আগ্রহ ও সামর্থ্য প্রমাণ করিতে তাহারা ব্যস্ত। নারীর শ্রী সৌন্দর্য্য কমনীয়তা শালীনতা সংযম ও প্রীতিস্নিগ্ধ সেবার আদর্শ বিসর্জন দিয়া তাহারা যেন পুরুষ সাজিতে ও পুরুষের মতো ধিঙ্গি হইয়া উঠিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প। ইহাতেই যেন তাহাদের পরমপ্রাপ্তি। কিন্তু প্রশ্ন হইল, নারীর জীবন ক্ষেত্র ও পুরুষের জীবনক্ষেত্র যেখানে জীবনের প্রয়োজনেই ও প্রকৃতির নির্দেশেই ভিন্ন এবং ভিন্নতর গুণের বিকাশের অপেক্ষা করে, ভিন্নতর পারদর্শিতার প্রত্যাশা করে—সেখানে একই প্রকারের শিক্ষা দীক্ষা ও কাজে কর্মে ব্যাপৃতি সংসারে কোন্ ঐকান্তিক সার্থকতা সুনিশ্চিত করিবে? আমি তো স্বামী স্ত্রী উভয়ের ডাক্তার বা ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার মধ্যে বিশেষ কোনো কল্যাণ দেখি না। দেশে যে কয়জন ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার ইত্যাদি প্রয়োজন তাহা পুরুষদের মধ্য হইতে তৈয়ারি করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সমাজে যতসংখ্যক কল্যাণী স্ত্রীর প্রয়োজন তাহা যেহেতু নারী ছাড়া কোনোমতেই জোগানো সম্ভব নয়, তাই পুরুষের বৃত্তিতে নারীর অনুপ্রবেশ কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। স্ত্রীজাতীয় ডাক্তার ইঞ্জিনীয়ার হাকিমের কাছে কল্যাণী স্ত্রীর ভূমিকা আশা করা যায় না। কারণ কল্যাণী স্ত্রীকে তাহার আপন সংসার তিলে তিলে রচনা করিতে হয়; তাহা যেমন অনুক্ষণ সেবা ও মনোযোগ সাপেক্ষ, তেমনি কল্যাণের পাঠে দীর্ঘ শিক্ষানবিশীও অপেক্ষা করে। যে নারী আশৈশব পুস্তকে মুখ গুঁজিয়া কেবল পরীক্ষা পাশের পড়া পড়িয়াছে, মাতার সংসারে কল্যাণব্রত উদ্‌যাপনের দীক্ষা সে নিশ্চয়ই পায় নাই। আপন সংসারেও কল্যাণসৃষ্টি তাহার পক্ষে সুসাধ্য নাও হইতে পারে। ইহার উপর আবার চাকুরির জোয়াল কাঁধে লইলে তাহার নারীত্ব কি কোনো সার্থকতায় উপনীত হইতে পারিবে?

দীপ্তি বলিল, সংসারের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই যে নারীর সার্থকতার সীমা, ইহা আমি স্বীকার করি না। নারী ও পুরুষ উভয়েই তাহাদের মিলিত প্রয়াসে মানব সভ্যতাকে নূতনতর জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আবিষ্ক্রিয়ার পথে নব নব সার্থকতায় উপনীত করিতে পারে। এই মহৎ অধিকার হইতে নারীকে কেন তোমরা বঞ্চিত করিতে চাও? গৃহ পরিবেশ না হয় আরো একটু কম উজ্জ্বল ও আনন্দময় হইল, নারীর গৃহিণীস্বরূপ মুক্তিলাভ করিয়া মানুষের নূতন ইতিহাস

রচনায় পুরুষের সঙ্গে যোগ দিলে মানবসমাজই কি লাভবান হইবে না। কেবল পুরুষই পরিপূর্ণ মানবিক অধিকার ভোগ করিবে এবং মানব ইতিহাস রচনায় ব্রতী হইবে, নারীর সেখানে কোনো ভূমিকা নাই—সে কেবল গৃহপরিধির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপন ক্ষুদ্র সংসারের মধ্যেই আপনার সব প্রতিভা ও ও ক্ষমতা নিঃশেষিত করিবে, এরূপ যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। মেয়েরাও যে মানুষ, এই স্বীকৃত অধিকারের সম্মান তাহারা মানুষের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি রচনায় আত্ম-নিয়োগের দ্বারা সম্মানিত করিবে। কেবলমাত্র পুরুষের রচিত সভ্যতা আজ যখন পৌনঃপুনিক যুদ্ধের পথে সার্বিক ধ্বংস ও সর্বনাশের মুখে আসিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়বৎ দাঁড়াইয়া দিগন্ত নিরীক্ষণ করিতেছে, তখন নারী তাহার স্বাভাবিক শান্তি ও সুষমার প্রতিভা লইয়া যদি ইতিহাসের এই সঙ্কটকে প্রশমিত করে, মানবজাতিকে পুনায়ন সার্থক সৃষ্টির পথে প্রত্যাবৃত্ত করে তাহা হইলে কি তাহা মহত্তর ভূমিকা হইবে না? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নারীকে আহ্বান করিয়াছেন, আধুনিক সভ্যতার উন্মার্গগামিতাকে ছন্দে সুষমায় ও কল্যাণের শাসন বন্ধনে সংযত সুনিয়ত করিবার কাজে। স্বাস্থ্যরূপিনী নারীই এই অসুস্থ সভ্যতাকে সেবা শুশ্রূষা ও নূতন সৃষ্টির প্রেরণায় সঞ্জীবিত করিতে পারে। নারীকে সেই ভূমিকা পালন করিতেই হইবে।

আমি বলিলাম, শ্রীমতী দীপ্তির আবেগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু প্রশ্ন এই—নারীগণ পুরুষের নির্বাচিত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া এযাবৎ পুরুষ-নিষ্পাদিত কার্য্যসকল করিতে শুরু করিলেই কি মানবসভ্যতার বিশেষ অগ্রগতি অথবা সুষমা সুনিশ্চিত হইবে? সে সম্বন্ধেও সাক্ষ্য প্রমাণ কি যথোচিত উৎসাহব্যঞ্জক? এই শতাব্দীর প্রথম পাদে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান-পরবর্তী ঔদার্যে, ইংলণ্ডে ও ক্রমে সকল পশ্চিমী দেশেই, নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। তাহাদের সুতীব্র ও সুদীর্ঘ সাফ্র্যাজিষ্ট আন্দোলনের ফলে এই সুমহৎ অধিকার তাহারা অর্জন করে। তারপর আজ পঁয়ষট্টি বৎসর অতিক্রান্ত হইল, নারীদের এই রাজনৈতিক অধিকার-সাম্য, পার্লামেণ্টে তাহাদের প্রবেশ, মন্ত্রীমণ্ডলীতেও অন্তর্ভুক্তি-এমন কি প্রধান মন্ত্রীত্বের গৌরব অর্জন—এ সবই ইতিহাসের বিষয় হইয়াছে। কিন্তু এই পঁয়ষট্টি বছরের মানব ইতিহাস কি রাজনীতিতে নারীদের এই বহুল অনুপ্রবেশ দ্বারা খুব বেশী সুষমাছন্দিত হইয়াছে? কিম্বা সেই পুরাতন ভাঙ্গ-সাম্যহীন প্রমত্ত চলনই এখনো দৃশ্যমান? সেই পুরাতন লোভ ক্ষোভ ঘৃণা বিদ্বেষ মিথ্যা ও শাঠ্যের বিবরাশ্রয়ী রাজনীতিই কি এখনো নানা অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথে স্বার্থসিদ্ধির চক্রান্তজাল বিস্তার করিতে ব্যাপৃত নয়? স্বার্থের ও

শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে? অথবা আপাদমস্তক আণবিক অস্ত্রসজ্জিত, উদ্যত-আয়ুধ, মারণোন্মুখ দুই প্রতিস্পর্ধী শিবিরের রণহুঙ্কার বর্তমান মানব প্রজন্মকে সর্বক্ষণ শঙ্কাকুল করিয়া রাখিয়াছে? পৃথিবীতে শান্তির ললিতবাণী কি সত্যই শ্রুতিগোচর হইতেছে, কিম্বা সর্বাত্মক মৃত্যুর পদসঞ্চার? নারীর কল্যাণী নিরাময় স্পর্শ-যে সভ্যতাকে এখনো সুস্থ করিয়া তোলে নাই তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। শতাব্দীকালের দুই তৃতীয়াংশ বিগত, তবু নারীর শ্রী সংযম শালীনতার কোনো স্বাস্থ্যকর প্রভাব বিশ্বসভ্যতার আত্মঘ্ন স্বভাবকে বিন্দুমাত্র সংশোধন করিতে পারিয়াছে মনে হয় না। কাজেই পুরুষের স্বক্ষেত্রে নারীর অভিক্রমণ সভ্যতাকে সমুন্নত অথবা স্বাস্থ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে এরূপে আশা করার মতো জোর আমি তো পাই না।

অন্যদিকে দেখ, নারী তার স্বক্ষেত্র, গৃহপরিমণ্ডল ত্যাগ করিয়া পুরুষের রাজ্যে পুরুষের সামিল হওয়ার অতিআগ্রহে, আপনার স্বভাবের বিপরীতে, পুরুষের দোষ ও কদাচারগুলি দ্রুত আয়ত্ত করিতেছে। ছেলেরা রাস্তাঘাটে ফেরীঅলার কাছে খাবার কিনিয়া সর্বসমক্ষে হুল্লোড় করিয়া আহার করে—মেয়েরা এখন অধিকার-সাম্যের দাবিতে দেখি অনুরূপ ভঙ্গিতে পথে-কেনা খাবার পথেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অসঙ্কোচ চর্বণ গেলনে ব্যাপৃত। বলা বাহুল্য এ দৃশ্য মোটেই দৃষ্টিনন্দন নয়। আমরা জানিতাম যে, মেয়েদের স্বাভাবিক আত্মশাসন ক্ষমতায় ও সরম সম্ভ্রমের আত্মসম্বৃত সুষমায় প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠতারই অভিপ্রকাশ ব্যঞ্জিত। কিন্তু এখন পৌরুষের স্থূল অভিকর্ষে মেয়েদের আত্মবিস্মৃত রুচিবিকারের মধ্যে সর্বত্র মানবাত্মার পরাজয় দেখিয়া বিষণ্ণ বোধ করি। স্ত্রীপুরুষের এই অবিমিশ্র সাহচর্য ও সহকর্মিতার ফলে যদি মেয়েরা পুরুষের দোষগুলি ও ছেলেরা মেয়েদের দোষগুলির দ্বারা সংক্রামিত হয় সেটা মানবসভ্যতার পক্ষে সর্বৈব ক্ষতির কারণ হইবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে মেয়েদের মধ্যে স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার সংযম-শাসন হইতে উদ্দণ্ড মুক্তির জন্য যে উদ্দাম অভিযান চলিয়াছে তাহাতে উদ্বিগ্ন না হইয়া পারি না। পশ্চিমের ছোঁয়াচ আমাদের পক্ষে প্রায়শঃই অপ্রতিরোধ্য হয়। এই ঘোলা বন্যায় আমরাও ভাসিয়া না যাই।

শ্রীমতী দীপ্তি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নারীজাতির প্রতি সভ্যতার স্বাস্থ্য-বিধানের কাজে উদাত্ত আহ্বানের উল্লেখ করিয়াছেন। কবিগুরু কিন্তু নারীর সভ্যতা-নৈরাময়িক ভূমিকার কোনো বাস্তব রূপরেখার আভাস দেন নাই।

নারী তার শ্রীসুষমা সংযম দ্বারা পুরুষের মাত্রাভ্রষ্ট সভ্যতাকে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে উত্তীর্ণ করিবে, কবি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি নারীর স্বক্ষেত্র পরিত্যাগ ও পুরুষের বৃত্তি ব্যবসায় ও কর্মক্ষেত্র সবলে অধিকারের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে? কবি এরূপ কোনো আভাষই দেন নাই। বরং পাশ্চাত্য নারীর উপকরণ-বাহুল্য প্রীতি এবং সহজ সাধারণ প্রতিবেশে অনাগ্রহ লক্ষ্য করিয়া তিনি দুশ্চিন্তাই প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা সহজ ও সাধারণ তাহার প্রতিই নারীর হৃদয়ের সদাব্রত। তাহারা স্নেহের অন্তর্দৃষ্টিতে সাধারণের মধ্যেও অসাধারণ মহিমা ও আপাত রূপহীনের মধ্যেও অপরূপ সৌন্দর্য দেখিতে পায়ে বলিয়াই এই ধূলিরুক্ষ সংসার আজও অমৃত আস্তরণে শ্যামল; পৃথিবীর সাড়ে পনের আনা মানুষ, যারা অতি সাধারণ, তাহারাও ভালবাসার আনন্দ রসায়নে বঞ্চিত নহে। কিন্তু পুরুষের সদা-অতৃপ্তি ও ভোগোপকরণ বহুলীকরণ মত্ততা, জটিল ও বৃহৎ যন্ত্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের মোহে কেবলই জড়াইয়া পড়ার মূঢ়তা, যদি তাহাদেরও আক্রমণ করে তাহা হইলে পৃথিবীর সব সরস-শ্যামলতা ও সংসারের আনন্দনির্ঝর শুকাইয়া মানবজীবন শ্রীহীন মরুভূমি হইয়া উঠিবে।

নরীর সার্থকতা প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট হওয়ায় নহে: প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের জায়া-জননী হওয়ায়। তাঁহারা যদি স্নেহ প্রেম করুণার স্পর্শে ও মহৎ ভাবরাজির সঞ্জীবনী রসে স্বামী-সন্তানের হৃদয়টি অমল সুন্দর আনন্দ-মুখরিত করিয়া তোলেন, তাহাই হইবে সংসারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। যদি সংসারের সর্বত্র তাঁহাদের স্বাভাবিক ছন্দসুষমা লাবণ্যপুষ্পিত হইয়া ওঠে, তবে তাহারই প্রভাবে পুরুষের মাত্রাহীন একঝোঁকা চলনও ছন্দসুমিত হইবে। নারী যদি আজ পুরুষের বহির্মুখিতায় আকৃষ্ট হইয়া তাহার আপন সৃষ্টির জগৎ, নীড়রচনা ও নবজীবন রচনার মহোচ্চ অধিকার, ও পুণ্য কর্তব্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, তাহাকে দুর্দৈব বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। গীতায় বর্ণসাঙ্কর্য্যকে ঘোরতর অমঙ্গলের বিষয় বলা হইয়াছে। ইহাকে ক্ষেত্র-সাঙ্কর্য্য বলিতে পারি। আপন ক্ষেত্র ও অধিকার ত্যাগ করিয়া পুরুষের ক্ষেত্র ও অধিকারে নারীর অভিক্রমণ এক চরম বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক প্রলয়ই ডাকিয়া আনিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। আপন আপন বিধাতা-নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি যথোচিত নিষ্ঠার সহিত পালনেই সকলের কল্যাণ। সৃষ্টির আদিযুগ হইতে মানুষের এই ত্রয়োদর্শন সহসা মিথ্যা হইয়া গেল, ইহা মনে করার সঙ্গত কারণ দেখি না।

লোকসিনী ধীরে ধীরে বলিল, তাহা হইলে কি বলিতে চাও আবহমানকাল

ওইতে নরনারীর যে-অধিকার বিভাগ নির্দিষ্ট হইয়া আছে তাহার সামান্য পরিবর্তনেরও কোনো যুক্তি নাই? দরিদ্র সমাজের নারীরা গৃহকর্ম, সন্তান প্রতিপালন ও শ্রমসাধ্য অর্থোপার্জন একত্রে নির্বাহ করে, সেখানে কিন্তু কোনো অধিকার লঙ্ঘনের নালিশ ওঠে না। কেবল অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্তদের ক্ষেত্রেই নারীর জন্য শুধুমাত্র গৃহ-পরিবারকেন্দ্রিক কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকিবে? যে নারীর আপন সংসার নাই, যে সন্তানহীনা বিধবা, অথবা বিবাহ-বিমুখ বা বিবাহবঞ্চিতা কৌমার্যব্রতিনী—তাহার কর্তব্য কেন গৃহসীমায় নিবদ্ধ থাকিবে? সে জীবিকার প্রয়োজনে পুরুষের কর্মক্ষেত্রে কেন না প্রবেশ করিবে? এবং পুরুষের উপার্জনমুখী শিক্ষালাভেই বা সে কেন বঞ্চিত হইবে? বর্তমান যুগে তো এরূপ নারীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান!

ব্যোম বলিল, পুরুষের সমপর্যায়ে শিক্ষাদীক্ষার ও পুরুষের ন্যায় স্বাধীন জীবন ও জীবিকার লোভ পশ্চিমের উন্নত নারীসমাজে মহামারীর ন্যায় ব্যাপক হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফল কী হইয়াছে জানো? ব্যাপক হারে নারীর স্বেচ্ছাবন্ধ্যাত্ব। এবং তার ফলে জন্মহারের মারাত্মক সঙ্কোচন। সভ্যতার অবক্ষয়ের এই লক্ষণকে বলা হয় classical symptom of degeneracy—সভ্যতার আসন্ন বিনষ্টির অন্যতম ধ্রুপদী লক্ষণ। নারী তার জীবধাত্রিত্ব তথা সন্তানধারণের জৈব কর্তব্য অস্বীকার করিতে উৎসুক—ইহাকে সর্বনাশা লক্ষণ না বলিয়া উপায় নাই। নারীদের পুরুষের জীবনধারা অবলম্বনের অত্যাগ্রহই সমাজকে এই ভাঙ্গনের মুখে আনিয়া ফেলিতেছে।

সমীর বলিল, এই উদ্দাম জলতরঙ্গ এখন কি আর রোধ করা সম্ভব? হিটলার অবশ্য নারীদের রন্ধনশালা ও সন্তানপালনের বৃত্তে ফিরিয়া যাইতে নির্দেশ দেন। গোঁড়া ঐস্লামিক রাষ্ট্রেও নারীদের পুরুষের কর্মক্ষেত্র পরিহার করিয়া স্বক্ষেত্রে অর্থাৎ অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করা হইতেছে। কিন্তু উন্নত গণতান্ত্রিক দেশে কি এ জাতীয় অধিকার-বিভাজন ও নিষেধবিধি জারী করা সম্ভব? অর্ধেক ভোটারই যেকালে-স্ত্রীজাতীয়া, সেখানে তাহারা সংবিধান প্রদত্ত যথেচ্ছ বৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতা কোনোমতেই বিসর্জন দিতে রাজি হইবে না।

ব্যোম কহিল, Alexis Carrel এর মতো পরাজীববিজ্ঞানী মনীষীর সাবধান বাণী সব রাষ্ট্রেরই শোনা উচিত! তিনি স্ত্রীপুরুষের একই প্রকার শিক্ষা, খেলাধূলা ও জীবনচর্যার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতিই নারীর দেহমনকে স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত করিয়াছে। প্রতিটি দেহকোষেই সেই

স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। তাহার সকল দেহযন্ত্র ও সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রই ভিন্ন পর্দায় বাঁধা। সন্তানের মাতৃত্ব ও ধাত্রিত্বের প্রয়োজনে প্রকৃতি তাহার দেহের উপকরণ ও স্বভাব বহুলভাবে বিশেষিত করিয়াছে। এবং মাতৃত্বের পথেই নারীর দেহমন ব্যক্তিত্বেরও পূর্ণ বিকাশ ঘটে। সেই মাতৃত্বকে অবহেলা করা বা এড়াইয়া যাওয়া নারীর পক্ষে আপন সত্তারই বিরোধিতা করা, আপন আত্মাকেই ব্যর্থ করার প্রয়াস।

নারী যথেষ্ট সুশিক্ষিত হউন আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহার সব শিক্ষা দীক্ষার মৌল অভিকর্ষ হইবে উৎকৃষ্ট সন্তানের জননী ও পালয়িত্রী হইবার পরিণামের দিকে। তাই তার শিক্ষার বিষয় ও কার্যক্রম ভিন্নতর হইবে—পুরুষের সহিত এক ছাঁচে ঢালা হইবে না। প্রকৃতির নির্দেশ আমাদের দেহমনের অণু পরমাণুতে সর্বদা উচ্চারিত হইতেছে: তাহা অমান্য করিলে বা তাহার বিরোধিতা করিলে প্রকৃতির অমোঘ রায় অনতিক্রম্য শাস্তিরূপে সর্বদাই নামিয়া আসিবে—সে শাস্তি ব্যক্তি ও জাতির ধ্বংস। পাশ্চাত্য জাতি ও সভ্যতার বর্তমান সঙ্কট যে কোন্ রন্ধ্রপথে তাহাদের আক্রমণ করিয়াছে, তৎপ্রতি এখনো অবহিত না হইলে তাহার নিরাময় অসাধ্য হইয়া উঠিবে। এ সঙ্কট আত্ম-দ্রোহের সঙ্কট, আত্মবিস্মৃতির সঙ্কট, নিজেকে না বোঝার সঙ্কট, প্রকৃতির প্রাণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পরোয়ানা জারির সঙ্কট। নাকে খৎ দিয়া সমূহ পশ্চাদপসরণ না করিলে এ-সভ্যতার বিনাশ অনিবার্য।

দীপ্তি বলিল, এ তোমাদের অন্যায় ভীতিপ্রদর্শন। নারীকে তাহার সর্ব প্রকার মানবিক অধিকার হইতে চিরবঞ্চিত রাখিবার ইহাই পুরুষজাতির চিরকালের ছল। এই যুক্তি দ্বারাই মেয়েদের এতকাল শিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইত এবং বিবাহ ও সন্তান ধারণই তাহার চতুর্বর্গ ইহাই তাহাকে শোনানো হইত। সে বিবাহও আবার শুরু হইতেই অসম্মানজনক, যেহেতু কন্যাকে প্রচুর যৌতুক উপঢৌকন দিয়া বরের কাছে নিজেকে বিকাইতে হয়। তারপর সেই যৌতুকের কিছু কম পড়িলে, বা সেই খাতে আরো কিছু আদায়ের উদ্দেশ্যে, বধূর উপর নির্যাতনের অবধি থাকে না, —সংবাদপত্রে সেই লোমহর্ষক কাহিনী ও তজ্জনিত বধূহত্যা তথা বধূর আত্মহত্যার অজস্র সংবাদ আমরা প্রত্যহ পাঠ করিয়া থাকি। আজীবন স্বামী অথবা পুত্রের পারবশ্যতাও সেই একই যুক্তির অনুক্রমে আসিয়াছে। তোমরা নারীকে আবার মধ্যযুগীয় অবরোধের মধ্যেই পুরিয়া রাখিতে চাও।

আমি বলিলাম, এরূপ অভিপ্রায় আমাদের কাহারো নাই। এবং ইচ্ছা

করিলেও কার্যে পরিণত করা আর সম্ভব নয়। সংবিধান এবং অন্যান্য নানা উদ্ধার বিধিবিধান তাহাতে পদে পদে বাধা দিবে এবং নারীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়াই করিবে। আমাদের আপত্তি সম-অধিকারের বিরুদ্ধে নয়—যদিও নয় ও নারীর ঠিক অধিকারসাম্যও সম্ভব নয়। মৌলিক অধিকার তাহাদের উভয়েরই সমান হইলেও নারীর কিছু বিশেষাধিকার অবশ্য গ্রাহ্য। নারীর উপরেই সমাজের বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখার বিশেষ দায়িত্ব। এজন্য তাহাদের যেমন কিছু বিশেষাধিকার চিহ্নিত হওয়া উচিত, তেমনি তাহাদের স্বতন্ত্র শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনচর্যার বিষয়েও সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা আবশ্যিক। প্রকৃতি তাহাদের যে-বিশেষ দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছে তাহার উদ্দেশ্য প্রণিধান করিয়া স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও জীবনধারার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হওয়া উচিত। এখানে উচ্চতর নিম্নতরের প্রশ্ন নাই—পুরুষ ভিন্নতর কর্ম নিষ্পাদনের জন্য প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত। তাহার শিক্ষা, খেলাধূলা ও জীবনধারা সেজন্যই অন্যতর হইবে। নারীর স্বাতন্ত্র্য তাহাকে ভিন্নতর শিক্ষাধারা ও জীবনপ্রণালীর জন্য নির্বাচিত করিয়াছে। নারীর স্বাধীন সত্তা ও মানবিক মর্যাদার কোনোরূপ হানি ঘটে ইহা আমরা কেহই চাই না। সেজন্য কঠোরতম আইনের বিধান ও তাহার সার্থক প্রয়োগ আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। যৌতুকের অত্যাচার ও অন্যান্য সকলপ্রকার জুলুম কঠোর শাস্তি দ্বারা নিষিদ্ধ হোক, আমরা সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু একটি সঙ্গত দাবীর সঙ্গে আরেকটি অসঙ্গত দাবী গুলাইয়া ফেলার আমি বিরোধী। নারীর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদার স্বীকৃতির দাবি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু সর্বত্র পুরুষের অনুকারী ও অনুসারী জীবনক্রম স্থাপনের দাবি কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। উহার দ্বারা যেমন নারীর নিজের ক্ষতি তেমনি সন্তানের ক্ষতি এবং সর্বোপরি সমাজ ও জাতির ক্ষতি সুনিশ্চিত,—এইজন্যই উহার বিরোধিতা করি।

সমীর বলিল, আশা করি পুরুষের তরফে এই কবুলজবাবের পরে নারীদের তরফে আর কোনো আপত্তি উত্থাপিত হইবে না। বেলাও অনেক হইল, গৃহনীড়ের জন্য সকলেরই অন্তরাত্মা নিশ্চয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সেই চিরপ্রতীক্ষমান সুশীতল নীড়ের গুণগান করিতে করিতে চলো এবার গৃহে ফিরি।

সকলেই বিনাবাক্যে উঠিয়া পড়িল।

হত্যাপরবর্ত্তী অধ্যায়

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর ভারতে একটার পর একটা দ্রুত পট পরিবর্তন ঘটে চলেছে। তবে সব পরিবর্তনের মধ্যেই অন্তর্নিহিত অবয়ব-সংস্থানের নিত্যতাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। কংগ্রেস সংসদীয় দল কর্তৃক প্রধান মন্ত্রী পদে শ্রীরাজীব গান্ধীর সুমসৃণ নির্বাচন সেই অব্যাহত ধারাবাহিকতার পরিচয়ই বহন করে। তারপর ডিসেম্বরের সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানেও সেই গণতান্ত্রিক ক্রমাগতিই সূচিত।

সংসদীয় নির্বাচনে কংগ্রেস দলের সুবিপুল সাফল্য নির্দ্বিধায় প্রমাণ করে যে, জনসাধারণ জাতীয় সঙ্কটের উপলব্ধি ও মোকাবিলায় অত্যন্ত সচেতন ও দায়িত্বশীল। দেশের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়ে তারা নিঃসন্দেহে তাদের চারিত্রিক ও রাজনৈতিক প্রাবীণ্যেরই পরিচয় দিয়েছে। এই সুষ্ঠু নির্বাচন আমাদের গণতান্ত্রিক বুনিয়াদের দৃঢ়ত্বেরও প্রমাণ।

আবার ফেব্রুয়ারী মার্চে ১০/১১টি বিধান সভার যে-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোল তার ফলাফলেও আমাদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সুস্বাস্থ্য প্রমাণিত হয়। দুই মাস পূর্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় বা সংসদীয় নির্বাচনে যে-জনগণ কংগ্রেসকেই বিকল্পহীন নেতৃপদে বিপুলভাবে বরণ করেছিল, তারাই এই বিধানসভার নির্বাচনে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রতি এবং অঙ্গরাজ্যগুলির স্বতন্ত্র প্রয়োজনের প্রতি যথোচিত মর্যাদা প্রদর্শন করে' আপন বিজ্ঞতার পরিচয় দেয়। বিধান সভা নির্বাচনে তিনটি রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে এবং অন্যান্য রাজ্যেও বিরোধীদলগুলি সম্মানজনক কৃতিত্ব দেখিয়েছে। এ সবই সুলক্ষণ এবং আমাদের ভোটদাতাদের বিচার শক্তির নিদর্শন।

রাজীব গান্ধীর নূতন মন্ত্রীসভা

নূতন সংসদীয় নির্বাচনের পরে শ্রীরাজীব গান্ধী যে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন তা বহুদিক দিয়ে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। পূর্বতন মন্ত্রীসভা গুলি থেকে এর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য, এতে তরুণতর সদস্যদের অধিকতর উপস্থিতি। এই মন্ত্রীসভার সদস্যদের গড় বয়স সম্ভবতঃ ৪০।৪২-এর বেশী নয়। প্রধানমন্ত্রীর নিজের বয়সের কাছাকাছি। শ্রীরাজীব গান্ধী ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর এই মন্ত্রীসভা

সর্বক্ষেত্রে কর্মিষ্ঠতার পরিচয় দেবে এবং দ্রুতগতিতে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। খুবই ভালো সঙ্কল্প এবং আমরা নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভাকে ও তার কর্ণধার প্রধানমন্ত্রীকে এই সঙ্কল্প ঘোষণার জন্য অভিনন্দন জানাই।

কিন্তু পঃ বঙ্গের জনগণ রাজীবের এই নূতন মন্ত্রীসভা গঠনে খুব উল্লসিত হতে পারেনি। বরং বিষন্নই বোধ করেছে, এই কারণে যে, এই মন্ত্রীসভা থেকে পঃ বঙ্গের দুইজন প্রাক্তন মন্ত্রী বাদ পড়েছেন। তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, এবং জনাব আব্দুল গনিখান চৌধুরী, প্রাক্তন রেলমন্ত্রী। এঁরা পঃ বঙ্গের জনগণের অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেন এবং মন্ত্রী-হিসাবেও এঁদের কৃতিত্ব ছিল অবিসংবাদী। তবু এঁরা দুজনই বাদ পড়লেন নতুন মন্ত্রীসভা থেকে, যদিও বেশ কিছু প্রাক্তন মন্ত্রী নূতন মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন দেখা যাচ্ছে। এর রহস্য অনুধাবন করতে না পেরে এ রাজ্যের কংগ্রেস সমর্থক জনগণ খুবই অসন্তুষ্ট ও বিষন্ন বোধ করে।

যা হোক জনাব খান চৌধুরীকে এ. আই. সি. সি.র অন্যতম জেনারেল সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত করে' তবু কিছুটা মুখরক্ষা করা হয়। কিন্তু প্রণব বাবুকে একান্ত রিক্তমহিমায় ফেলে রেখে দেওয়া হোল। বলা বাহুল্য এটা অনেককেই ক্ষুব্ধ করে। প্রণববাবু খুবই যোগ্য লোক এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অত্যন্ত আস্থাভাজন মন্ত্রী ছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিও এ-কে অসৌজন্য জ্ঞান করলো অনেকে।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত প্রণব মুখোপাধ্যায়কে পঃ বঙ্গের রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতিরূপে মনোনীত করে পাঠানো হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস তিনি তাঁর যোগ্যতা ও কার্যক্ষমতা এক্ষেত্রেও প্রমাণ করবেন এবং পঃ বঙ্গের কংগ্রেস সংগঠনকে শক্ত ও মজবুত করে' আগামী বিধান সভা নির্বাচনের চরম শক্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করবেন।

নূতন অর্থমন্ত্রী ও তাঁর বাজেট

শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং নতুন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। ইনি অভিজ্ঞ ও সৎ রাজনীতিক বলে খ্যাত। ইনি তাঁর নতুন বাজেটে অনেক অভিনবত্ব করেছেন। অবশ্য বাজেট ও রাষ্ট্রের আর্থিক কর্মনীতির রূপরেখা প্রধান মন্ত্রীরই নির্দেশে রচিত হয়। তবু এর সামগ্রিক ও অনুপুঙ্খ রূপরচনা অর্থমন্ত্রীর কাজ। এই বাজেটে ইনকামট্যাক্স ও ওয়েল্থ্ ট্যাক্সের হার অনেক কমানো হয়েছে এবং মোটা হারে কর রেহাই দেওয়া হয়েছে। অন্য দিকে এইটে

পুষিয়ে নেওয়ার জন্ত পেট্রল ডিজেল কেরোসিন ও আরও অনেক নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর উপরে বেশী করে' কর চাপানো হয়েছে। ওদিকে টি. ভি. ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির উপর কর হ্রাস করা হয়েছে। এই কারণে অনেকে এই বাজেটকে ধনীদের মনরাখা বাজেট বলে নিন্দা করেছেন।

তবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, এবং কিছু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও, এই বাজেটকে উন্নয়নমুখী এবং উন্নয়নের পথে এক সাহসী পদসঞ্চার বলে অভিনন্দিত করেছেন। সম্প্রতি যে আমদানী-রপ্তানী নীতি ঘোষিত হয়েছে তাতেও সুস্পষ্ট যে, নতুন সরকার সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত বদ্ধপরিকর এবং সে উদ্দেশ্তে আইন-কানুন বিধি-নিষেধের বদবদল করতে তাঁদের কোনোই দ্বিধা নেই। পদে পদে বিধি-নিষেধের নিগড় যে উৎপাদনকে এতকাল ব্যাহত করছিল ও কালো-বাজারী অসাধুতার সৃষ্টি করছিল তাতে কোনো ভুল নেই। একথা অনেকে বহুবার বলেছেনও। উন্নত দেশগুলির অর্থনীতির পদাঙ্ক অনুসরণ না করলে উন্নতির মান কিছুতেই দ্রুততর করা যাবে না এবং এই বিশাল দেশ তার বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও দারিদ্র্যের 'পঙ্কে বদ্ধ করী'র মতো ক্রমেই দুর্গতির তলায় যে তলিয়ে যেতে থাকবে এ-বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নেই। চীনের মতো সোস্যালিষ্ট দেশও এখন মুক্ত অর্থনীতির দিকে ঝুঁকছে। আমরা 'সোসালিষ্টিক প্যাটার্ন'-এর মোহে পড়ে, আমাদের অর্থনীতি ও উৎপাদন নীতিকে নানা বাঁধাবাঁধির দ্বারা কেবলই অসার্থক করে এসেছি। তাতে ক'রে দারিদ্র্যই বেড়েছে অথচ ধনীদের কোনো অসুবিধা হয়নি ; কিন্তু না বেড়েছে উৎপাদন, না কমেছে সর্বব্যাপ্ত অসাধুতা। কাজেই এই নতুন অর্থনীতি ও নতুন বাজেটকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।

নতুন রেল-বাজেট

নতুন রেলমন্ত্রী এখন শ্রীবংশীলাল। কাজের লোক বলে এঁর সুনাম আছে, তবে দুর্নামও আছে সুনীতি-দুর্নীতির তেমন ধার ধারেন না বলে'। আমরা রেলবিভাগে এঁর কর্মিষ্ঠতার নিদর্শন দেখব আশা করেছিলাম। কিন্তু ইনি তাঁর নতুন রেল-বাজেটে যেভাবে শতকরা বারো টাকা হারে যাত্রীভাড়া ও শতকরা পনেরো টাকা হারে মালের মাশুল বাড়িয়েছেন, তাতে সর্বত্র প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে। এর অনিবার্য ফল যে মোটা হারে সবস্তরে মূল্যবৃদ্ধি —সে আশঙ্কা সকলেই প্রকাশ করছেন।

কিন্তু এই ভাড়া ও মাশুল বৃদ্ধির ফলে কি রেল যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা

আরাম কিছু বাড়বে ? সেরূপ আশা করার সঙ্গত কারণ নাই। নইলে এই ঘোর গ্রীষ্মের মধ্যে শহরতলির ট্রেনগুলিতে অধিকাংশ পাখাই যথাপূর্বং অদৃশ্য হয়ে থাকতো না। দরজা-জানালা ও বসার আসনের জীর্ণ ভগ্নদশাও সংস্কার হোত। ট্রেনের সংখ্যা ও সময়ানুবর্তিতা বাড়তো, ভীড়ের দুঃসহ চাপও কমতো। এবং রেল-কর্মচারীদের কর্মনিষ্ঠতা, সততা ও দায়িত্বগুণেরও উন্নতি পরিলক্ষিত হোত। কিন্তু সেসবের কোনো লক্ষণই নেই।

রেলমন্ত্রী বলছেন, অনেক নতুন লাইন বসাতে হবে, পুরনো লাইনের সংস্কার করতে হবে, পরিষেবার মান উন্নত করতে হবে, সবচেয়ে বড় কথা লোকসান কমাতে হবে। এদিকে দেখছি পশ্চিমবাংলার বেশ কয়েকটি রেল-প্রকল্প তিনি এরই মধ্যে খারিজ করে দিয়েছেন। যুক্তি—ওগুলি লাভবান হবে না। কিন্তু এ-প্রকল্পগুলি তো আজকের নয় ; দীর্ঘকাল ধরে এদের প্রয়োজন উপলব্ধি করে' তবে হাতে নেওয়া হয়েছিল। আর লাভের দিকটাই কি সব ? একটা অঞ্চলের সুখ-সুবিধা দেখতে হবে না ? সুন্দরবন অঞ্চলে এ-যাবৎ কোনো রেললাইন যায়নি। একটা বিস্তৃত এলাকার জনগণ সুদীর্ঘকাল অসুবিধা ভোগ করছে : স্বাধীনতার প্রায় চল্লিশ বছর পরেও তাদের অবস্থার সুরাহা হবে না ? স্বাধীনতার তাৎপর্য তারা উপলব্ধি করবে কী করে ? পশ্চিম-দিনাজপুরের বালুরঘাট থেকে মালদহ পর্যন্ত কোনো রেল যোগাযোগ নেই, একটা জেলার অর্ধেকই এই চির দুর্ভোগের শিকার হয়ে আছে আজ আটত্রিশ বছর। তাদের উদ্ধারের প্রকল্পকে বাতিল করা চরম অন্যায় বলেই গণ্য হবে। আমরা আশা করবো নতুন রেলমন্ত্রী তাঁর এসব সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করবেন।

পাঞ্জাবের পরিস্থিতি

পাঞ্জাবের পরিস্থিতির কোনোই উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। এর মুখ্য কারণ শিখ সম্প্রদায়ের এবং আকালী নেতৃবৃন্দের ধর্মান্ধ বুদ্ধি-বৈপরীত্য। তাঁরা ভিন্দ্রানওয়ালে ও তার হত্যা-বিভীষিকা-সন্ত্রাসপন্থী অনুগামীদের কার্যকলাপ সমর্থন করেছেন, এখনও করছেন। এরই বিষময় ফলস্বরূপ স্বর্ণমন্দিরে সৈন্য অভিযান ঘটে। এবং তারই অনুক্রমে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ঘৃণ্যতম বিশ্বাসঘাতকদের গুলিতে নিহত হতে হয়। এবং তজ্জনিত সারা-দেশের উদ্দীপিত ক্রোধাগ্নিতে কয়েক হাজার শিখ বলি পড়ে এবং তাদের প্রচুর সম্পত্তির হানি হয়। এখনো পাঞ্জাবের বাইরে শিখরা নিজেদের যথেষ্ট

নিরাপদ মনে করে না: এখনো তারা সর্বত্র ঘৃণা ও অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে আছে এটা অনুভব করে। তবু, আকালী নেতৃবৃন্দ ও শিখ পুরোহিতশ্রেণী এক আত্মঘাতী নীতি অনুসরণ করে চলেছেন।

তারা উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ এখনো সমর্থন করে চলেছেন! যদি শিখদের ভারতের সর্বত্র সসম্মানে বাঁচতে হয় তা হলে ঐ নেতৃবৃন্দকে সর্বপ্রথম উগ্রপন্থীদের তীব্রভাষায় নিন্দা করতে হবে, এবং তারা যে শিখপন্থার শত্রু এবং দেশের শত্রু এবং শিখদের স্বার্থই বিপন্ন করছে—এই সত্য জোরগলায় ঘোষণা করতে হবে। নইলে সত্য সত্যই শিখদের কল্যাণ নাই।

এই মাসখানেক আগে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য-সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মানচণ্ডাকে উগ্রপন্থীরা নৃশংসভাবে হত্যা করে। সারাদেশে এর বিরুদ্ধে ধিক্কার উচ্চারিত হয়। কিন্তু শিখ নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের কোনো নিন্দাবাদ শোনা যায়নি। আবার এই দু'দিন আগে (১৯. ৪. ৮৫) কংগ্রেসের একজন বড়দরের নেতা, এ. আই. সি. সি.'র অন্যতম জেনারেল সেক্রেটারী, শ্রীআর. এল. ভাটিয়াকে উগ্রপন্থী আততায়ীরা তাঁর বাড়ীতে ঢুকে হত্যার উদ্দেশ্যে বারংবার গুলি করে। দ্রুত অস্ত্রোপচার দ্বারা তাঁর দেহ থেকে তিনটি বুলেট নিষ্কাশিত করে' তাঁকে এবারের মতো কোনোক্রমে বাঁচানো গেছে। কিন্তু তাঁরই গৃহে সমাগত অতিথিদের একজন ঐ উগ্রপন্থী আক্রমণে নিহত হয়। এই দুষ্কর্মের তীব্র নিন্দা ও ধিক্কারে আকালী নেতৃবৃন্দ এখনো সোচ্চার হননি।

এই ধরণের হত্যাকাণ্ড ও উগ্রপন্থী কার্যকলাপ পাঞ্জাবে এখনো যথেচ্ছ চলেছে। শিখ নেতৃবৃন্দের নীরব সমর্থন ও শিখ সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এসব দুষ্কর্ম তারা এত অসঙ্কোচে এতদিন ধরে চালাতে পারতো না। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত লঙ্গোয়াল ও আরও বেশ কিছু আকালী নেতৃবৃন্দকে কারামুক্ত করেছেন। শিখ ছাত্র ফেডারেশনের উপর থেকেও নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছে। এমন কি চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দেওয়া হবে এবং ইন্দিরা হত্যা-পরবর্তী শিখ বিরোধী দাঙ্গার সম্বন্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে, এ আশ্বাসও কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। আকালীদের বেশ কিছু দাবী এই ভাবে মেনে নিয়ে সরকার আশা করছিলেন যে শিখ নেতৃবৃন্দ অনুরূপ আপোষমূলক মনোভাব দেখাবেন। কিন্তু কার্যতঃ কি দেখা গেল? সন্ত লঙ্গোয়াল ভিন্দ্রান-ওয়ালের গুণগান করলেন এবং ইন্দিরা-হত্যাকারীদের আত্মীয় স্বজনদের প্রকাশ্য সভায় সম্মানিত করলেন! এবং শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক

সমিতির সভাপতি শ্রীগুরুচরণ সিং তোহরা বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাওয়া মাত্র (১৯.৪.৮৫) এক ফতোয়া দিলেন যে ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকারীরা শহীদ ! এই সব নেতৃবৃন্দ যে একান্তই বুদ্ধিভ্রষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। নইলে তাদের ন্যায়-অন্যায়ের, পাপ-পুণ্যের সব বোধ এমন বিপরীত হয়ে যাবে কেন ?

গীতায় বলেছেন :

"অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।

সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥" [গীতা, ১৮শ অধ্যায়, ৩২]

এই শিখ নেতৃবৃন্দ সেই তামসিক বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হয়েই অধর্মকেই ধর্ম ও সব ব্যাপারকেই বিপরীত দৃষ্টিতে দেখছেন তাতে সন্দেহ নেই। খুবই দুঃখের কথা, এর দ্বারা কেবল দেশেরই ক্ষতি করা হচ্ছে না, সমস্ত শিখ সম্প্রদায়ের স্বার্থেরই ক্ষতি সাধন করা হচ্ছে। এখনো যদি ঐ নেতৃবৃন্দের প্রজ্ঞাদৃষ্টির উদয় না হয়, কিংবা শিখ জনসাধারণ ঐ নেতৃবৃন্দকে অস্বীকার না করে, তা হলে শিখদের পক্ষে সমূহ অকল্যাণ অপেক্ষা করছে। (২১।৪।৮৫)

শ্রীলঙ্কায় তামিলদের জীবন-মরণ সঙ্কট

শ্রীলঙ্কায় স্বতন্ত্র তামিল রাষ্ট্রের দাবিতে উগ্রপন্থীরা দীর্ঘ দিন ধরে হিংস্র আন্দোলন চালাচ্ছে এবং ফলে সরকারী সৈন্য ও পুলিশবাহিনীর প্রতিহিংসক নির্যাতনে তাদের ও নিরীহ তামিল অধিবাসীদের ধনে প্রাণে ভয়ানক মূল্য দিতে হচ্ছে। আমরা এ বিষয়ে পূর্বেও বলেছি। শ্রীলঙ্কা তার দেহে 'পাকিস্তান' সৃষ্টি করতে কিছুতেই দেবে না। তামিল রাষ্ট্র স্থাপনের আশা বাতুলতা। তবে একটি তামিল-সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সহ, তাদের পাওয়া অসঙ্গত নয়। এবং তদুদ্দেশ্যেই সংবিধান সম্মত পন্থায় তাদের আন্দোলন করা উচিত। কিন্তু আন্দোলন এখন উগ্রপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে, এবং তারা দুঃশাসন ও সকল নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ফলে হত্যালীলা ও প্রতিহিংসক হত্যালীলার রক্তাক্ত অধ্যায় কেবলি রচিত হয়ে চলেছে—যার কোনো বিরতি যে কখনো ঘটবে তা মনে হয় না।

আসলে, যেখানেই জাতিগত বা বর্ণগত সংঘাতের কারণ ঘটে সেখানে গান্ধীজী প্রদর্শিত অহিংস সত্যাগ্রহ ছাড়া, অন্য কোন কল্যাণকর আন্দোলন-পন্থা নাই। ঐ পথেই ধীরে ধীরে ন্যায়বিচার ও অধিকার পেতে হবে। এবং পাওয়া যে যায় তা দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজী স্বয়ং প্রমাণ করেছিলেন দীর্ঘ অহিংস সংগ্রাম দ্বারা।

আমেরিকায় কৃষ্ণকায়দের মানবিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনও ঐ পন্থায়, মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে ও আদর্শে, কিছুটা সুফল প্রসব করেছে। ঘৃণাকে ঘৃণা দ্বারা উচ্চকিত করে', হিংস্রতাকে হিংস্রতা দ্বারা উদ্দীপিত করে' বৃহৎ অগ্নিকাণ্ডই ঘটানো যায়। কোন স্থায়ী সুষ্ঠু সুন্দর সমাধান পাওয়া সম্ভব নয়। মানব স্বভাবই এইরূপ। গান্ধীজী তা বুঝতেন। গান্ধীজীর স্বদেশবাসীরাও কি তা বুঝবে না?

কলকাতা সম্বন্ধে রাজীব গান্ধীর উক্তি

লোকসভায় এক বিতর্কের সময়, বিতর্কের সাময়িক উত্তেজনায় শ্রীরাজীব গান্ধী কলকাতাকে "মুমূর্ষু" নগরী ('dying') বলায় লোকসভা এবং পঃ বঙ্গ অনেক বাদ-প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিতর্কের বিষয় ছিল, কলকাতায় দমদম বিমানবন্দর থেকে বহু বিদেশী বিমান সংস্থা কেন ফ্লাইট ক্যানসেল করছে অর্থাৎ কলকাতা বিমানবন্দরকে ব্যবহারে আর আগ্রহী নয়? পঃ বঙ্গের এক সি. পি. এম. সদস্য এজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্য, বা অধিকতর নিন্দার্হ 'বিমাতৃসুলভ' বিদ্বেষকে দায়ী করে' বক্তৃতা কালে বলেন যে, কলকাতাকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজরা এক কালে 'এক্সপ্লয়েট' করেছে ও পরে দেশের অন্য প্রান্তীয়রা করছে। সেই খোঁচায় জবাবে রাজীব গান্ধী বলেন যে, কলকাতা মুমূর্ষু ('dying') তাই অনেক বিমানসংস্থাই কলকাতার প্রতি আর আগ্রহী নয়; এবং কেউ যদি কলকাতাকে এক্সপ্লয়েট করে থাকে তো সি. পি. আই. এম. সরকারই করছে।

এখন দুটো কথা নিয়ে প্রবল বাদবিতণ্ডা হচ্ছে। কলকাতাকে সত্যই মুমূর্ষু বলা চলে কি না? এবং বলাটা কলকাতার প্রতি ও কলকাতাবাসীদের প্রতি উন্নাসিক অবজ্ঞা কি না? আর দ্বিতীয়তঃ, বামফ্রন্ট সরকার কলকাতার এই দুরবস্থার জন্য দায়ী কি না এবং তারাই কলকাতাকে 'এক্সপ্লয়েট' অর্থাৎ শোষণ করছে কিনা? কলকাতাবাসীরা প্রায় সকলেই এ-শহরের ক্রমবর্ধমান অসহনীয় অবস্থার বিষয়ে সচেতন এবং নিত্য অভিশাপমুখর। কিন্তু তবু তারা কলকাতাকে ভালওবাসে এবং তাই কেউ এর নিন্দা-মন্দ করলে রাগ করে, প্রতিবাদও করে। ইদানীংকার অনেক প্রতিবাদই সেই আহত অভিমান জনিত।

আবার পঃ বঙ্গের সরকারী দলগুলি এই সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকারকে মনের সুখে গালাগালি করছে; কারণ, কলকাতার মুমূর্ষুতার জন্যে রাজীব গান্ধী যে

এই সরকারকে দায়ী করেছে, কলকাতার 'এক্সপ্লয়টার্স' অপবাদ দিয়ে,—তার ঝাঁজটা কিছু সত্য বলেই এরা সহ্য করতে পারছে না। এই বামফ্রন্ট সরকার কলকাতাকে শোষণ করছে কি না ঠিক জানি না, তবে 'এক্সপ্লয়েট' শব্দের অর্থ শুধু শোষণ নয়, নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনো কিছুকে ব্যবহার করাও। এবং বামফ্রন্ট সরকার যে, কলকাতার ক্রমবর্দ্ধমান দুরবস্থা এবং লোকের বিরক্তির উত্তাপ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেতে দেখেও, প্রায় নিষ্ক্রিয় ও নির্বিকার তাতেও তো ভুল নেই। এঁরা যানবাহন সমস্যার সমাধানে অক্ষম বা অনাগ্রহী ; এঁরা লোড-শেডিংএর মোকাবেলা করতে অপারগ বা অনিচ্ছুক ; এঁরা শহরের নোংরামি ও জঞ্জাল ঘুচাতে ও জীর্ণতা সংস্কারেও অনুদ্যোগী ; এঁরা ব্যবসা বাণিজ্য কল কারখানার ক্রমাবনতি রোধে নিষ্ক্রিয় অথবা নিস্পৃহ ; এঁরা মিছিল মোর্চা অবস্থান ঘেরাও প্রভৃতির অতিবৃদ্ধি রোধেও অনীহ ; তার উপর এঁরা নিজেরাই মাঝে মাঝে বন্ধ্ ডেকে বা রেল-রোকো আন্দোলন করে' শহরের জীবনযাত্রা ও কর্মচক্র বিপর্য্যস্ত করার প্রবণতায় ভোগেন। কলকাতার বাস-যোগ্যতা কমছে দেখেও তার প্রতিরোধে এঁদের কেনো প্রবল উদ্যম দেখা যায় না। এ সব কিছুর জন্য কেন্দ্রের উপর দোষারোপ করে', কেন্দ্রকে অভিযুক্ত করে' রাজনৈতিক মুনাফা লোটার বদভ্যাস হয়ে গেছে এঁদের। কলকাতা স্বাস্থ্যে লাবণ্যে তৈলচিক্কন হয়ে উঠলে সেই সুযোগটা চলে যায়। তা ছাড়া এও তো অস্বীকার করা যায় না যে, কম্যুনিষ্ট দর্শনেই বলে যে, লোকে দুরবস্থায় ক্ষিপ্ত হয়ে না উঠলে বিপ্লব আসে না। তাই লোকের জীবনযাত্রা যতো বেশী দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তাতেই ওঁদের স্বার্থ। কাজেই কলকাতার অস্বাস্থ্য ও কুরূপতা যতোই বৃদ্ধি পায় ওঁদের রাজনৈতিক আনন্দও ততোই হয়তো বাড়ে। এরূপ অনুমানও হয়তো অসঙ্গত নয়। এই দৃষ্টিতে দেখলে কলকাতার ক্রমমৃমূর্ষুতা যে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারের ইচ্ছাকৃত অবহেলার ফল, এরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা শ্রীরাজীব গান্ধীর এই উক্তিকে তাই খামখেয়ালী বা দায়িত্বহীন উক্তি বলে' মনে করি না।

ইরান-ইরাক যুদ্ধ

ইরান-ইরাক যুদ্ধের বয়স পাঁচ বছর অতিক্রম করলো। কিন্তু তার ভয়াবহতা এখনো কমেনি, শীগ্‌গির কমবে বলেও মনে হয় না। শাত্তিল-আরব মোহানায় খর্গ্‌ দ্বীপের দখলের দাবি নিয়ে ইরাক লড়াই শুরু করে। কিন্তু এখন যুদ্ধের উন্মাদনা ও ক্রমবর্ধমান ক্ষয় ক্ষতি অন্য সব উদ্দেশ্যকে চাপা

দিয়েছে, এখন দু পক্ষেরই জিদ অন্য পক্ষকে একেবারে চরম শিক্ষা দিয়ে পরাস্ত করা। এখন ইরাকের আছে অস্ত্রবল, ইরাণের জনবল। ইরাক মিলিটারী শাসনাধীন, ইরান ধর্মোন্মাদ ঐস্লামিক শাসনাধীন। দুইই স্বৈরতান্ত্রিক, তবে জনগণের সমর্থন পুষ্ট। দুই দেশেই যুদ্ধের ক্লান্তি ও হতাশা যে জনগণকে তাদের নিজ নিজ সরকারের পতন বা পরিবর্তন আনতে উদ্বুদ্ধ করবে তাও মনে হয় না। দুপক্ষই মুখে শান্তির প্রতি আস্থাশীল কিন্তু কার্যত শান্তির শর্ত্ত লঙ্ঘনে ক্লান্তিহীন। ইউ. এন. ও-র সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ডি. কুয়েয়ার-এর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে, নির্জোট গোষ্ঠীর উদ্যোগও ফলপ্রসূ হয় নি, সম্মিলিত আরব এবং ঐস্লামিক রাষ্ট্রজোটও ব্যর্থ হয়েছেন এই দুই বিবদমান নিকট প্রতিবেশীকে এই আত্মঘাতী যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করতে। কিন্তু দুই বৃহৎ শক্তি শিবির এব্যাপারে এখনো নীরব। তাঁরাই দুপক্ষের অস্ত্রের জোগানদার এবং এ ব্যবসায় লাভও মন্দ হচ্ছে না, তাই যুদ্ধ চলাটা তাঁদের স্বার্থবিরোধী নয়। তা ছাড়া নিজের নিজের অস্ত্রের পরীক্ষাও হচ্ছে এই রণাঙ্গনে—এবং ঐসব অস্ত্রের কার্য্যকারিতা দেখে তাঁরা নতুনতর অস্ত্র আবিষ্কারের ইঙ্গিত সংগ্রহ করছেন। ইরান ইরাকের পেট্রোলিয়ামের স্রোত শীর্ণতর হলেও দুই শিবিরেই তা যথাপূর্ব গিয়ে জমা হচ্ছে। কাজেই তাঁদের মন্দ লাগছে না এই যুদ্ধের তামাশাটা।

যে পরিস্থিতি, তাতে মনে হয়, আয়াতোল্লা খোমেইনি বা প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেন—এ দুজনের কেউ ইহলোক ত্যাগ না করা পর্যন্ত যুদ্ধের বেগ কমবে না।

পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট জিয়ার গণভোট

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক জঙ্গী শাসক হলেও, তাঁর রাজনীতিক কূটবুদ্ধি কারও চেয়ে কম নয়। অনেকদিন জঙ্গী আছেন, প্রায় আট বছর—এখন জনসমর্থিত অসামরিক ভদ্র প্রেসিডেন্ট না হলে আর ভালো দেখায় না। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দলগুলি তা ভদ্র উপায়ে হতে দেবে না। কাজেই তিনি তাদের নেতাদের সব বন্দী করে' গণভোট নিয়ে নিজেকে জাতে তুললেন। আরো ছয় বছর কাল তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকতে পারবেন, জনগণের রায় ও পরিবর্তিত সংবিধান তাঁকে সেই সেই অধিকার দিয়েছে। গণভোটের বিষয়টি ছিল অতি চমৎকার। ইসলামের সেবক প্রেসিডেন্ট জিয়ার ইসলামীকরণনীতি ও কার্যকলাপ পাকিস্তানের জনগণ সমর্থন করে কিনা এবং সেই উদ্দেশ্যে তারা তাঁকেই পুনরায় প্রেসিডেন্ট রূপে দেখতে চায় কি না। জনগণের অধিকাংশ নাকি জিয়া সাহেবের পবিত্র ইসলামীকরণ—

নীতি ও কার্যাবলি সমর্থনই করেছে। কাজেই তাঁর প্রেসিডেন্ট থাকার দাবিও। এরপর দলবিহীন ভোটের মাধ্যমে তিনি এক পার্লামেন্টও খাড়া করেছেন এবং সেখানে দলবিহীন এক প্রধানমন্ত্রী এবং ক্যাবিনেটও মনোনীত করেছেন। ক্রমে নাকি পাকিস্তানে অসামরিক শাসনই কায়েম হবে। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে জিয়া সাহেবের এই আশ্চর্য রাজনীতিক হাত সাফাই দেখছে। কেউ কেউ হাসছে কিন্তু তিনি তাদের গ্রাহ্য করেন না। তিনি জনসমর্থিত তথা সৈন্যদল সমর্থিত প্রেসিডেন্ট। তিনি একক ও অনন্য। (২২. ৪. ৮৫)

বাংলাদেশেও গণভোট

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সুযোগ্য ভাবশিষ্য হলেন 'বাংলাদেশের' জঙ্গী নায়ক প্রেসিডেন্ট এরশাদ। মিলিটারীর হাতে সব ক্ষমতা রেখেও কী ভাবে জনগণের ভোটে প্রেসিডেন্ট হওয়া যায় এরই দুঃসাধ্য চেষ্টায় তিনি নিয়ত ছিলেন। নিজে একটি রাজনৈতিক দলগঠন করেও রাজনীতির খেলায় খুব সুবিধা করতে পারছিলেন না। শেষে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের গণভোটের চালটাই মোক্ষম অস্ত্র মনে হোল তাঁর। তাই বিরোধী রাজনীতিকদের সব বন্দী ও কণ্ঠবাক্ করে রেখে তিনিও প্রেসিডেন্ট জিয়ার মতোই জনগণের সমর্থন চেয়ে গণভোট নিয়ে ফেললেন। সরকারী খবর যে, তিনিও—প্রেসিডেন্ট জিয়ার মতোই—বিপুল জনসমর্থনে জনগণের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। বিরোধী নেতৃবৃন্দ এখনো বন্দী, রাজনৈতিক কার্যকলাপও এখনো নিষিদ্ধ। কাজেই এরশাদ সাহেব এখন মনের সুখে আরও বেশ কিছুকাল ঐ গদীতে রইলেন। জঙ্গী শাসনও কায়েম রইলো। তিনিও নাকি জিয়ার মতো 'যথাসময়ে' জঙ্গী শাসন তুলে নেবেন। এখন দীর্ঘ দিনের মতো গোঁজামিল-তন্ত্রই কায়েম হয়ে রইলো!

নয়া রুশ রাষ্ট্রপ্রধান

কন্‌স্টান্‌টিন্ চেরনেঙ্কোর মৃত্যুর পর সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার নতুন রাষ্ট্র-নায়ক হয়েছেন মিখাইল গরবাশভ। পূর্ববর্তী সোভিয়েত প্রধানদের থেকে তাঁর বয়স অনেক কম—পঞ্চাশের কোঠায়। এবং তিনি নাকি পশ্চিমী রাষ্ট্র-নায়কদের মনে আশার সঞ্চার করেছেন যে, তিনি নবীনতর ও উদারতর দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করবেন, এবং পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই শিবিরের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সন্দেহ ও অবিশ্বাসের নিরসনের জন্য সত্যই সচেষ্ট হবেন।

পরমাণবিক অস্ত্রসংবরণের প্রশংসনীয় আগ্রহ তিনি ইতিমধ্যেই ব্যক্ত করেছেন এবং একতরফা ভাবে পূর্বয়ুরোপ থেকে মাঝারি পাল্লার পরমাণবিক রকেট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছেন তিনি। কিন্তু পশ্চিমী শিবির থেকে তাঁর এই আণবিক যুদ্ধ নিবারণউদ্দেশী প্রয়াসের অনুরূপ কোনো কার্যক্রম এখনো ঘোষিত হয়নি। তবে জেনিভায় অস্ত্রসংবরণ আলোচনা পুনরায় সুরু হয়ে হৃদ্যতার পরিবেশেই অগ্রসর হচ্ছে বলে প্রকাশ। যদি দুই পক্ষই পরমাণবিক অস্ত্র সংবরণে সমান আগ্রহী হয়, এবং পারস্পরিক বিশ্বাস অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের নিজের আয়ুধ-সজ্জা ও আয়ুধ-সঙ্কোচনের কার্যাবলি অপর পক্ষকে খোলাখুলি দেখবার সুযোগ দিয়ে নিশ্চিন্ত করে, তা হলে হয়তো ক্রমে সর্বপ্রকার পরমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়া অসম্ভব হবে না।

(২৩. ৪. ৮৫)

ভূপালের ট্র্যাজেডি

গত ২রা ডিসেম্বর মধ্য রাত্রি থেকে শেষ রাত্রির মধ্যে ভূপালের ইউনিয়ন কারবাইড কোম্পানীর কীটনাশক তৈরীর কারখানায় যে ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছোটখাটো 'হিরোশিমা'র মতো। ঐ বিস্ফোরণের ফলে নির্গত বিষবাষ্পে ভূপাল শহরের ঐ ঘন বসতি এলাকায় হাজার হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে, এবং তার বহু গুণ মানুষের ঘটে মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি। গৃহপালিত জীবজন্তুও মরেছে অগুন্তি। সে এক প্রলয়ঙ্কর অভিশপ্ত রাত্রির অভিজ্ঞতা।

ইউনিয়ন কারবাইড একটি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থা, পৃথিবীর নানা দেশে তাদের কারখানা আছে। কোম্পানীর হেড অফিস আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে,—সেখানেও তাদের বড় কারখানা রয়েছে। কিন্তু এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটি ঘটলো শুধু ভারতেই। যে সব মারাত্মক রাসায়নিক সামগ্রী নিয়ে এই সব কীট-নাশক তৈরী হয়, একটু অসাবধান হলেই তা থেকে বিধ্বংসী কাণ্ড ঘটতে পারে। তাই সাবধানতার অনেক বাঁধাবাঁধি এদের মেনে চলতে হয়। এবং চলা উচিত। দেখা যাচ্ছে এক্ষেত্রে সেই সাবধানতায় শৈথিল্য ঘটেছিল।

ভারত সরকার ঐ কারখানা বন্ধ করে দিয়েছেন—এবং কোম্পানীর কাছে বহু কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ দাবী করে' মামলা করাও স্থির করেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরাও অনেকে নিজে অথবা আত্মীয় মারফত খোদ আমেরিকাতেই কোম্পানীর বিরুদ্ধে মোটা ক্ষতিপূরণের দাবির মামলা রুজু করেছেন। ফলে

কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে গেলেও যেতে পারে। কিন্তু তাদের অসাবধানতা-জনিত এই নিদারুণ অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই। ভারত সরকার এবং মধ্য প্রদেশ সরকারের দায়িত্বও এ ব্যাপারে কম নয়। তাঁরা প্রথমতঃ ঐ ঘনবসতি এলাকায় এরূপ একটি বিপজ্জনক কারখানা স্থাপন করতে অনুমতি দিয়েছিলেন কোন্ যুক্তিতে! দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা কারখানায় নিশ্ছিদ্র সাবধানতা অবলম্বিত হচ্ছে কিনা তারও যথোচিত তত্ত্বাবধান করেননি।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির রথটি মৃত্যুবাহিত। বাহন একটু নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলেই মৃত্যুর মহোৎসব লেগে যায়। এই কথাটি সর্বদা স্মর্তব্য।

গুজরাটের দাঙ্গা হাঙ্গামা

গত আড়াই মাস ধরে গুজরাটের রাজধানী আহমেদাবাদে সরকারী-সংরক্ষণ-বিরোধী আন্দোলন চলেছে। ক্রমে তা থেকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্ফোরণ ঘটেছে। ঘটার কথা নয় তবু যে ঘটেছে—এর পেছনের কার্যকারণ যোগটি খুঁজে দেখা দরকার। মুসলমান সমাজ কি ভাবে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে তা খুবই রহস্যময়। আহমেদাবাদে এখন মিলিটারী নামানো হয়েছে কিন্তু তবু অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

আমরা কোনো ক্ষেত্রেই সহিংস আন্দোলনের পক্ষপাতী নই, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে গুজরাট সরকারের অতিব্যাপক সংরক্ষণ নীতি অত্যন্ত ভ্রান্ত। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগতেই পারে। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারেরই উচিত সর্ব ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতির এই ধারাবাহিকতায় ছেদ টানা। এই সংরক্ষণ নীতির ফলে এক কায়েমীস্বার্থভোগী, নয়াব্রাহ্মণশ্রেণী উৎপন্ন হয়েছে। এর পরিণতি খুবই অস্বাস্থ্যকর।

১৯৯০-এর পরে যেন এর জের আর না টানা হয়। যোগ্যতমকে বঞ্চিত করে' অযোগ্য পোষণ দ্বারা কোনো দেশেরই কল্যাণ হতে পারে না। যোগ্যতা সত্ত্বেও যারা বঞ্চিত তাদের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ একদিন ফেটে পড়বেই। দূর-দৃষ্টিহীন রাজনীতিক মুনাফাবাজরা যে আগুন নিয়ে খেলছেন তা বুঝতে পারছেন না।

(২৫. ৪. ৮৫)

মানবকল্যাণে অরণ্য পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী

আজকের যুগে কবির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা সম্ভব নয়—'দাও ফিরে সে অরণ্য', কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সামাজিক এবং অর্থনীতিক প্রগতির প্রয়োজনেই আরণ্য পরিবেশকে বাঁচিয়ে রাখা জরুরী হয়ে পড়েছে। মানব সমাজ, সভ্যতা ও পরিবেশ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল এই কথা ভুলে গিয়ে কিছু অজ্ঞ এবং মুনাফালোভী মানুষ সর্বত্র পরিবেশকে কলুষিত করছে, প্রাচীন অরণ্যকে ধ্বংস করছে। ফলে সমস্ত পৃথিবীতে আজ প্রায় এক হাজার দুষ্প্রাপ্য প্রাণী এবং পঁচিশ হাজার উদ্ভিদ প্রজাতি নিশ্চিত অবলুপ্তির মুখে। এমন অনেক গাছপালা ও প্রাণী রয়েছে যাদের আজও নামকরণই হয়নি।

নিজেদের ভবিষ্যতকে নিরাপদ করবার জন্যই পরিবেশকে কলুষমুক্ত রাখায় আমাদের উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন। নতুন অভয়ারণ্য সৃষ্টি, বন সংরক্ষণ এবং পার্ক সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে এ কাজ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব।

পরিবেশ সংরক্ষণে নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হলে সামান্য সময়ের ব্যবধানেই আমরা আমাদের প্রচেষ্টার পুরস্কার পেয়ে যাবো।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

তথ্য ও সংস্কৃতি—১০৭৬৭/৮৪

Registration No. R.N. 18431/70
ALEKHYA • VOL XV Nos. 2-3 • Nov. '84-Apr. '85

গ্রন্থাগার – গণশিক্ষার একটি মাধ্যম

গ্রন্থাগারের মত গণশিক্ষার একটি শক্তিশালী মাধ্যম দীর্ঘকাল অনাদৃত পড়ে ছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় [illegible]র পর নতুন শিক্ষানীতি এবং নবপর্যায়ে গৃহীত কয়েকটি ব্য[illegible] আওতায় গ্রন্থাগারের কাজ বিপুল উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

গত সাত বছরে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৭৭৬ [illegible] বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১৬। এছাড়া ১৯৭৯ সালের গ্রন্থাগার [illegible] এবং তার কয়েকটি সংশোধনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলিকে আ[illegible] সুচারুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে। যথাযথ কার্যনির্বাহ [illegible] উন্নয়নের জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি গ্রন্থাগার অধিকার একটি গ্রন্থাগার সংসদ।

সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে সুচিন্তিত জনমত গ[illegible] তোলার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুবিধাকে এমনকি [illegible] পল্লীগ্রামেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। ৮৩৭টি গ্রন্থাগারে খোলা হয়েছে শিশু-বিভাগ, সারা ভারতবর্ষে এর নজীর আর নেই।

৯-১৪ বছর বয়েসের যেসব ছেলেমেয়ে অর্থনৈতিক [illegible] জীবিকার্জনের জন্য বিদ্যালয় ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে [illegible] খোলা হয়েছে ১৬,৬৬০টি প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষাকে[illegible] ৪ বছরে এইসব কেন্দ্রে ১১·৪৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার্জন করেছে। সরকারের ৩৪ দফা কর্মসূচীর অন্তর্গত বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পের ২২ হাজার কেন্দ্রেও শিক্ষালাভ করেছেন ৬ লক্ষ মানুষ। এঁদের শিক্ষার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বই আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুফল পৌঁছে দেবার কাজে এগিয়ে আসতে হবে প্রতিটি সচেতন মানুষকে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আলেখ্য ১৫ বর্ষ ২য়-৩য় সংখ্যা মূল্য : চার টা[illegible]

শ্রীকিতীন্দ্রচন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক ৩৩-বি মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬ [illegible] 'ইন্দ্রেশন' প্রেস হইতে মুদ্রিত ও ৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলিকাতা-৭৫ হইতে প্রকাশিত।

[illegible] 1985